বেতার বাংলা

ফাল্গুন–চৈত্র ১৪২৯

অ আ ক খ

১২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে বঙ্গভবনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী শহীদুল্লাহ'র নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল কমিশনের '৪৮তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' পেশ করেন

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে 'জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩' উপলক্ষ্যে আসন্ন বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলাপ্রশাসকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে জাতীয় সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষাৎ করেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৯ ● ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ - ১৩ এপ্রিল ২০২৩

সম্পাদকীয়

ষড়ঋতু দেশ বাংলাদেশ। ঋতু পরিবর্তনের ধারায় এখন ফাগুন হাওয়ার দোল লেগেছে বাংলার প্রকৃতিতে। ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠছে প্রকৃতির সবুজ অঙ্গন। শীতের বোলসে থাকা নিসর্গ- পলাশ, শিমুলের অলৌকিক স্পর্শে জেগে উঠেছে। মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসা ফুলের গন্ধ জানিয়ে দিচ্ছে বসন্ত এসেছে। স্বাগত ঋতুর রাজা বসন্ত।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...'। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশসহ সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এটি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ও স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের এইদিনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো রফিক, জব্বার, শফিউর, সালাম, বরকত-সহ নাম না জানা অনেকেই। ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বাঙালির অধিকার আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যে যেমন ভৌগোলিক স্বাধীনতার কথা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাও ধারণ করেছে। একাত্তরের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর এই উদ্দীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা। এরপরই দেশের মুক্তিকামী মানুষ ঘরে ঘরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ঐতিহাসিক এই ভাষণ পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি- বিশ্ব বেতার দিবস। 'বেতার ও শান্তি' (Radio and Peace)- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে বেতার বাংলার সকল পাঠক, গ্রাহক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৯৬ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ক্যাশ)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত
নিলন সব্যসাচী ১০

বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় সেই ভাষণ- যা স্বাধীনতা এনে দেয়
মোহাম্মদ শাহজাহান ১৮

গণমাধ্যমে বাংলা ভাষা
ড. সৌমিত্র শেখর ২৪

গণসম্প্রচারের ইতিবৃত্ত (১৯২২ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (প্রথম পর্ব)
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব ৩৩

বাসন্তী সাজে ঋতুরাজ বসন্ত
শাহান আরা জাকির ৩৭

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী: সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের নিরাপদ আশ্রয়
শাহনাজ সিদ্দীকি সোমা ৪০

একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত
সৈয়দা তাসলিমা আক্তার ৪৫

গল্প

ভালোবাসার পাখি
মোবলেহা খাতুন ২৮

বেল্ট
রহমান তৌহিদ ৪৩

বেতার সংবাদ ৯৫

বেতার অঙ্গনায় ৯৮

১০২

কবিতা

শহিদ মিনার : বাংলাদেশ
সোহরাব পাশা ১৭

একুশের কবিতা
পারভেজ বাবুল ১৭

বাঙলা ভাষার বসন্ত
রীনা তালুকদার ১৭

জেগে ওঠা কণ্ঠস্বরে
এস এম তিতুমীর ২২

মায়ের বোলে
কামাল বারি ২৭

বিধ্বস্ত জমিনে স্বপ্নবুনি
রফিকুল ইসলাম ২৭

ফাগুন
মনিজা বানম ২৭

তোমার দু'চোখে চোখ রেখে
আ. শ. ম. বাবর আলী ৩২

ভালোবাসার পরগনা
কবরুল করিম ৩২

তরুপল্লব

ক্যাপির গল্প
আসিফ মেহদী ৪৮

নতুন বই
হাসু কবির ৪৯

স্নিগ্ধ সজীবতা
ওয়াজ কুরুনী সিদ্দিক ৪৯

ছোট্ট শিশু
রিয়াজ মাহমুদ রাতুল ৪৯

মায়ের খোকা
বারী সুমন ৫০

স্বপ্ন
জাহাঙ্গীর চৌধুরী ৫০

বেতার পর্ব

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৫২

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৬৫

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৭৫

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৭৬

বাংলাদেশ বেতারের এফ এম ট্রান্সমিটারসমূহ ৭৯

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৮২

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

৩০ মাঘ ১৪২৯
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

বিশ্বে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রোতামণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় গণমাধ্যম বেতার জনগণের কাছে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বেতার প্রত্যন্ত ও দুর্গম প্রান্তে জরুরি বার্তা, নানামুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে বেতার হতে পারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রেক্ষিতে বিশ্ব বেতার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও শান্তি (Radio and Peace)'- বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ বেতার দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ বেতার ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বেতার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ ও নারীনির্যাতন রোধ, সন্ত্রাস, গুজব ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু, করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সতর্কতা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে বাংলাদেশ বেতার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৯
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে বেতারের শিল্পী, শ্রোতা, সম্প্রচারকর্মী ও কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বেতার দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও শান্তি (Radio and Peace)'- ইউক্রেন-রাশিয়ার চলমান যুদ্ধে বিপর্যস্ত বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রাচীনতম গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করার পর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়ন, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরাসহ সার্বিক উন্নয়নে অনবদ্য ভূমিকা রেখে আসছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মহান মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রামে অনন্য ভূমিকা রাখে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ তৎকালীন স্বৈরশাসকের বাধা উপেক্ষা করে ৮ মার্চে বেতারে প্রচার মুক্তিকামী বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় বাংলাদেশ বেতার নিরলসভাবে এদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশ বেতার বিনোদন ও তথ্য সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সম্প্রচারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় একনিষ্ঠভাবে নিরন্তর সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। একইসঙ্গে, সমসাময়িক ও যুগের চাহিদা মেটাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে অ্যাপ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ ও অনুষ্ঠান ইন্টারনেটে দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের শ্রোতার কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। জনমানুষের কাছে নানা তথ্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতার রেখে চলেছে তার মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আপামর জনতার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতার জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে।

আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশে প্রথম স্যাটেলাইট বেসরকারি টেলিভিশন চালুর অনুমতি দেয় আমাদের সরকার। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯'। এছাড়াও প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪'। বেসরকারি খাতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল, এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে অডিও ভিজ্যুয়ালসহ ইলেকট্রনিক যোগাযোগে এসেছে নতুন মাত্রা। দেশে গণমাধ্যম ভোগ করছে পূর্ণ স্বাধীনতা।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে, বৈচিত্র্য আনয়নে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সঠিক বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রচার এবং সৃজনশীল অনুষ্ঠান বেতারকে আরও বেশি সংখ্যক শ্রোতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমার প্রত্যাশা- বাংলাদেশ বেতার সরকারের চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মানুষকে অবহিত করা অব্যাহত রাখবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' তথা জাতির পিতার আজীবন স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৯
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী, কলা-কুশলী, শুভানুধ্যায়ী, বেতারের শ্রোতামণ্ডলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বেতার একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সব ধরনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু মিডিয়া বৈচিত্র্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। স্বাধীন গণমাধ্যম শান্তি ও স্থিতিশীলতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ প্রেক্ষিতে বেতার বিশ্বে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও বিশ্বস্ত গণমাধ্যম। এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও শান্তি (Radio and Peace)' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের উত্তরসূরি বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে একটি সুপ্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ বেতারের নাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকেরা তাঁদের কণ্ঠযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

সম্প্রচার পরিধি এবং সম্প্রচার সময় বিবেচনায় বাংলাদেশ বেতার দেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। বাংলাদেশ বেতার আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনমানুষের তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম উৎস। এছাড়াও যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করে মানুষকে সচেতন করতেও বাংলাদেশ বেতারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে দুই হাজারেরও বেশি শ্রোতাক্লাব। দেশ ও বিদেশের কোটি কোটি শ্রোতার উদ্দেশে প্রতিদিন সংবাদ আর অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে দেশের এই প্রাচীন গণমাধ্যমটি। বাংলাদেশ বেতার সরকারের নীতিমালা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিনোদন, খেলাধুলাসহ সকলক্ষেত্রে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করে জাতীয় অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখছে। এছাড়াও রূপকল্প-২০৪১ ও ডেল্টা পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নত-সমৃদ্ধ ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নানামুখী তথ্য সরবরাহ করে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে বাংলাদেশ বেতার।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বাংলাদেশ বেতার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৯
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব বেতার দিবস। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সাল থেকে দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে।

আজকের এ বিশেষ দিনে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, শ্রোতা, বিজ্ঞাপনদাতা, সম্প্রচারকর্মীসহ সকল কলাকুশলীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রতি বছর বিশ্ব বেতার দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সমাজে বাংলাদেশ বেতারের গুরুত্ব এবং এর কার্যকর ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়। এবারের বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও শান্তি (Radio and Peace)', যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও নানাবিধ বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশ বেতার শ্রোতা চাহিদা অনুযায়ী সংবাদ এবং সৃজনশীল অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

বাংলাদেশ বেতার তাদের সংবাদ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুজব, অপপ্রচার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে শ্রোতাদের সচেতন করার পাশাপাশি জনগণের তথ্যের অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কৃষি, জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক সম্প্রচারের সুফল পাচ্ছেন দেশ-বিদেশের শ্রোতারা।

১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' নামে বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে বাংলাদেশের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ বেতার অব্যাহত ভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংবাদ এবং অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে। দুর্যোগ ও সংকটে বাংলাদেশ বেতার সবসময় সবখানে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বেতারের সম্প্রচার কার্যক্রম পৌঁছে যাচ্ছে দেশের দূর্গম অঞ্চলে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ব্রান্ডিং সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ বেতার বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশ গড়ার কাজে সকলকে আগ্রহী করে তুলতে বাংলাদেশ বেতার তার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার

বেতার ও শান্তি

নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

ভূমিকা

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের একটি ভাড়াবাড়িতে পাঁচ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' নামে যাত্রা শুরু করেছিল। বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস। দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম জাতীয় গণমাধ্যমটি এ অঞ্চলের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে রেখেছে অনন্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের বিষয়বস্তু দেশের আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল বাংলাদেশ বেতার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ ও অনুষ্ঠান দেশের মুক্তিকামী জনতাকে করেছিল উজ্জীবিত। যুদ্ধকালীন বাংলার মানুষ অধীর আগ্রহে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ও সংবাদ শুনতো। এই কেন্দ্রের সূচনা সংগীত ছিল 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'। ঠিক এভাবেই দেশের সকল আন্দোলন সংগ্রাম আর রক্তিমপ্রে বাংলার মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ বেতার।

বেতার ও শান্তি

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চলমান সংঘাত ও বৈশ্বিক সংকটের কারণে এ বছরে বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও শান্তি (Radio and Peace)' অত্যন্ত অর্থবহ হয়ে উঠেছে, যা বাংলাদেশ বেতারের জন্যও সময়োপযোগী। বাংলাদেশ বেতার যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতেও জনগণের কাছে অনুষ্ঠান ও সংবাদের মাধ্যমে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম।

বেতারের কর্মপরিধি

সময়ের পথ বেয়ে বাংলাদেশ বেতার অতিক্রম করেছে সুদীর্ঘ ৮৩ বছর। কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশ বেতারের কর্মপরিধি অনেক বেড়েছে। দীর্ঘ এই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ বেতারের কলেবর, জনবল, কার্যক্রম এবং সম্প্রচার সময়। বৈশ্বিক মহামারি করোনা মোকাবেলায় মধ্যম তরঙ্গ, ক্ষুদ্র তরঙ্গ, এফএম ট্রান্সমিটারের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফরম অর্থাৎ ওয়েবসাইটে অনলাইন স্ট্রিমিং এবং মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে তথ্য দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করছে বেতার। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যথা- ফেইসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহার করে বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারসীমার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের শ্রোতাদের কাছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতার প্রতিনিয়ত সম্প্রচার করছে অনুষ্ঠান ও সংবাদ। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ এবং এসডিজি সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাভিত্তিক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ১৬টি মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার, ২টি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার ও ৩৪টি এফএম ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ৬টি ইউনিট ও ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন ৫০০ ঘণ্টার অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচার করে থাকে। বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসহ দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ, হারামো দিনের গানের সংগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এই অডিও আর্কাইভ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণে মূল্যবান ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বেতার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণে বেতারকর্মীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "মনে রাখবেন কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না।" স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ইউনিট থেকে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন ঘটনা ও স্থান নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'আমাদের বঙ্গবন্ধু', জাতির পিতার জীবন ও

কর্মের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ', বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা অনুষ্ঠান, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জনসাধারণের ভাবনার উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, কারাগারের রোজনামচা ও অসমাপ্ত আত্মজীবনীর উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক পাঠ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান, বিশেষ গীতিনকশা, কবিতা, নাটক প্রচার করেছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা 'কেমন দেখেছি তাঁরে' এবং 'তিনি আমাদেরই লোক' শিরোনামে প্রতিদিন ২টি করে প্রতিবেদন প্রচার করছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশে বেতার

বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ও ঐতিহ্য লালন-পালনে বাংলাদেশ বেতারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাঙালি জাতির নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর বিনোদন ও তথ্যের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে অনুষ্ঠান ও সংবাদ। বাংলাদেশ বেতারে বর্তমানে ত্রিশ সহস্রাধিক বিভিন্ন ধরনের তালিকাভুক্ত শিল্পী রয়েছেন যারা বাংলাদেশ বেতারের ২০টি কেন্দ্র/ইউনিটে নিয়মিত অনুষ্ঠান করছে। এছাড়া রয়েছে হাজার হাজার অনিবন্ধিত শিল্পী যারা অনিয়মিতভাবে বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শিল্পীদের জীবন-মান উন্নয়নে, প্রতিভা বিকাশে এবং শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন-পালনে বাংলাদেশ বেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

দুর্যোগকালীন সম্প্রচারে বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন Standing Orders on Disaster- এর নির্দেশিকা অনুযায়ী যথাযথভাবে জরুরি তথ্য ও সতর্কবার্তা দিয়ে জনগণের পাশে থেকে রাতদিন নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করে থাকে। এ সময়ে প্রতিটি জেলার সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ বেতার জনগণকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণের জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও বার্তা নিয়মিত প্রচার করে। দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে জনগণকে সচেতন করতে বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, সংবাদ, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রচার করে।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ও বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বিরোধ মীমাংসা, ব্লু-ইকোনমি, মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণে বিজয় অর্জন, তথ্যাচার, এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জন, তথ্য অধিকার আইন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, সরকারের উন্নয়ন, তথ্য বাতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিয়মিত অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার প্রচার করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান ও সংবাদ। জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দিয়েছে বেতার। এছাড়াও ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ঘোষিত ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ের অবৈধ সরকারগুলোর ব্যর্থতা তুলে ধরে '৭৫ পরবর্তী অবৈধ সরকার' শিরোনামে অনুষ্ঠান, জঙ্গি ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনা সমুন্নত রাখা নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। এছাড়াও বৈশ্বিক মহামারি করোনা মোকাবেলায় বছরব্যাপী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করেছে বাংলাদেশ বেতার। জাতীয় অনুষ্ঠান, জাতীয় সংবাদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ও গুণীজনদের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করছে বাংলাদেশ বেতার।

গণসচেতনতা গড়তে গুজব, মাদক এবং জঙ্গিবাদের মতো বিভিন্ন বিষয়ের কুফল নিয়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষামূলক বিশেষ অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারিত হয়ে আসছে বেতারে। একই সঙ্গে সরকারের নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ বেতার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের প্রত্যাশার কথা স্মরণে রেখে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণের কথা তুলে ধরে সংবাদে প্রতিবেদন প্রচার করার পাশাপাশি বহিরাঙ্গনের মতো জনমুখী অনুষ্ঠান প্রচার করছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও মাঠ থেকে বিভিন্ন ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক খেলা সরাসরি সম্প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। এই সম্প্রচার বাংলাদেশ বেতারকে জনগণের কাছে করে তুলছে অধিক জনপ্রিয়। ক্রীড়াঙ্গনের খবরাখবর নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রচার হয় অনুষ্ঠান ও সংবাদ।

বেতার শ্রোতাক্লাব ও বাংলাদেশ বেতার

সারাদেশে বাংলাদেশ বেতারের প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতাক্লাব রয়েছে। এই ক্লাবসমূহের সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক ও গণসচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এছাড়াও বিশ্ব বেতার দিবসের শ্রোতা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত চিঠি লিখে বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। নিয়মিতভাবে সংবাদ পাঠক-পাঠিকা ও শিল্পীদের নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে বেতার। বাংলাদেশ বেতারের একমাত্র প্রকাশনা শাখা হলো বেতার প্রকাশনা দপ্তর। এটি ১৯৫১ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই দপ্তর থেকে বর্তমানে

প্রতি দুইমাস অন্তর 'বেতার বাংলা' প্রকাশ করা হচ্ছে। এই 'বেতার বাংলা'র মাধ্যমে বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, যা সুশীল সমাজ, শিল্পী, কলাকুশলী এবং শ্রোতাদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিউমিডিয়া ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার

তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধনে বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রবেশের সাথে সাথেই পেশাদারিত্বের সাথে বাংলাদেশ বেতার নিউমিডিয়া জগতে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিউমিডিয়ার আবির্ভাবের ফলে বেতারকর্মীগণ তথ্য-প্রযুক্তির নতুন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভা ও ইনোভেশনের মাধ্যমে বেতার অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করে তুলছেন। মাল্টি-স্কিলিং দৃষ্টিভঙ্গি এবং পেশাদারিত্ব অর্জন করে বাংলাদেশ বেতারের কর্মীগণ অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল শাখায় সুনামের সাথে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। নিউমিডিয়া অনুষ্ঠান বিশেষ করে ফোন-ইন লাইভ অনুষ্ঠান, এসএমএস ভিত্তিক অনুষ্ঠান, ফেইসবুক লাইভ, ফেইসবুক ক্যানপেইজ, বেতার লাইভ স্ট্রিমিং-এর মতো অনুষ্ঠান প্রচার করছে বাংলাদেশ বেতার। এসব অনুষ্ঠানে বেতার শ্রোতারা সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও ফিডব্যাকের মাধ্যমে বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদের মান-উন্নয়ন এবং বৈচিত্র্য আনয়নে ভূমিকা পালন করছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতারের আধুনিকায়নের কাজ এগিয়ে চলছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে ২টি করে এফএম ও এইচডি ট্রান্সমিটার চালু করা হয়েছে। যার ফলে এইচডি প্রযুক্তিতে ডিজিটাল সম্প্রচার সম্ভব হয়েছে। সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ বেতারের নবতর সংযোজন ২টি ডিএসএনজি ভ্যান। বর্তমানে এসডিজি, সরকারের অগ্রাধিকারযোগ্য প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ও এর সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সংবাদে নিউজ আইটেম, ভয়েস ইনসারসন এবং প্রতিবেদন আকারে প্রচারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বেতারে নিউজ অটোমেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ফলে সংবাদ প্রস্তুত করা থেকে সংবাদ রিপোর্টিং পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। লাইভ রিপোর্ট করার জন্য কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০৪১ সালে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তথ্য প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের ফলে অপার সম্ভাবনার চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সফল করতে বর্তমান সরকারের বহুমাত্রিক পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের প্রচার করছে বাংলাদেশ বেতার। ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তরে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল শাখায় তথ্য প্রযুক্তির আধুনিকায়নে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সঙ্গে কাজ করছে। বর্তমানে বেতারের সাথে সম্পৃক্ত মিডিয়াগুলোর মধ্যে বিবিসি, এনএইচকে, প্রসার ভারতী অন্যতম। বাংলাদেশ বেতার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) ও AIBD (Asia Pacific Institute for Broadcasting Development) এর পূর্ণ সদস্য। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার PMA (Public Media Alliance), CBA (Commonwealth Broadcasting Association), IBU (Islamic Broadcasting Union)-এর সদস্য। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও সেমিনারে বাংলাদেশ বেতার অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ বেতার Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD)-তে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে পরপর দুই মেয়াদে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশ বেতার তার কার্যক্রমের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অসংখ্য পুরস্কার অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকার জন্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বেতারকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের সংগ্রহে রয়েছে ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বাংলাদেশ বেতারের সকাল ৭টা ও রাত সাড়ে ৮টার সংবাদ একযোগে সকল এফএম চ্যানেলে প্রচারিত হওয়ায় দেশের জনগণ দেশ-বিদেশের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছেন। বাংলাদেশ বেতার দেশের কমিউনিটি রেডিওতে নিয়মিতভাবে কনটেন্ট সরবরাহসহ কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের উন্নয়ন, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নাম বাংলাদেশ বেতার। সরকারের চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে ও দেশের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রমিত বাংলা ভাষা ও স্বদেশি ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলবন্ধন রচনা করে বাংলাদেশ বেতার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে জ্ঞানভিত্তিক মানবসম্পদ তৈরি করে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে নিষ্ঠার সাথে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ বেতার। বাংলাদেশ বেতারের অঙ্গীকার- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা।

আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত

মিলন সব্যসাচী

বিপ্লবী চেতনার অগ্নিপুরুষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ বাঙালি জাতিকে যিনি দিয়েছেন- ভাষারাষ্ট্র ও জাতিরাষ্ট্রের শীর্ষবিন্দুস্পর্শী সম্মান। বিদ্রোহের অর্থ অধীকৃতি প্রদান আর বিপ্লবের অর্থ বোধহয় অঙ্গীকার। অঙ্গীকারের জঠর থেকে নবযুগের জন্ম। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির নয় প্রতিটি বাংলাভাষীর প্রাণের প্রিয়মানুষ। ২১শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন সংগ্রামী নেতা মুজিবের দূরদৃষ্টি শক্তি ছিল অসাধারণ। নন্দিত-নেতৃত্বে, সাহসী-সংগ্রামে, মেধা-মননে, শাসনে-শোষণে, রক্তিত-ব্যথায়, মিছিলে-মিটিংয়ে, মহামুক্তির ভাষণে ও বারবার কারাবরণে তিনিই তাঁর তুলনা। তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুবার কারাবরণ করেছেন। তাঁর সাহসী পদক্ষেপের সকল কীর্তি, সুমধুর সাম্যনীতি, অসম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষমুখী পৌরবগাথা ও মহান স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের প্রেরণাশক্তি। সারা বিশ্বের সব বাঙালির একান্ত আত্মজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সংগ্রামী দৃঢ়চেতা মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপকার। আন্তর্জাতিক স্তরে বাঙালির জাতিগত, ভাষাগত, বাংলাভাষা এবং বাংলাদেশকে উন্নীত করে আত্মমর্যাদার সাথে স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। যে সকল বঙ্গসন্তান বাঙালির গর্ব ও অহংকারের ঠিকানা সেই মঞ্চে শেখ মুজিব সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁর অসীম আকাশের মত বুকে বিস্তৃত স্বপ্নের সবটুকু জুড়ে ছিল বাঙালি জাতিকে স্বাধীন ভূখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস এবং প্রতিজ্ঞা। সমন্বিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সর্বাগ্রে তিনি মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং সম্মান অনুভব করেছিলেন। এমন মর্মস্পর্শী অনুভবের অন্তলাস্তিক গভীর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরল সফল ও সমুজ্জ্বল করা।' সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। সেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালালো চলে, কিন্তু একমাত্র তার তেল যোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নিভালো চলে না। মানুষের মনের গহীনে প্রবেশের জন্য যে আকুতি অনিবার্য হয়ে ওঠে সেই আকুলতার নির্ভরশীল বিনিময় তার হৃদয়স্পর্শী মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং

তাৎপর্যপূর্ণ এ প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম। ওই বছরেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের করাচিতে পাকিস্তানের শিক্ষা অধিবেশন আহ্বান করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামের আদর্শে ঢেলে সাজানোর প্রয়াসে অধিবেশন আহুত হয়। অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে এই মর্মে উল্লেখ ছিল যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। একতরফা এই প্রস্তাবের পরিণামে বহুমাত্রিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কারণ উর্দু পাকিস্তানের প্রথম ভাষা হিসাবে স্বীকৃত নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায়ও উর্দুকে প্রথম ভাষার স্থানে মেনে নিতে পারেনি। তখন বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জন্য তমদুন মজলিশের বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীও পাশে দাঁড়ান। সরকারি সব কাগজপত্র, মুদ্রা, মানি অর্ডার ফর্ম ও ডাকটিকেটে ইংরেজি ও উর্দুভাষা মুদ্রণের কারণে জনগণের সমস্যা ও হয়রানি চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বেড়ে যাচ্ছিল। অথচ বৃটিশ ভারতের শাসন আমলে জনসাধারণকে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। এক সময় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক জানানো হয় 'সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তরপত্রে লেখার মাধ্যম হিসেবে উর্দু, হিন্দি, ফার্সি ও আরবি ভাষা ব্যবহার করতে হবে। বাংলা ব্যবহার করা চলবে না। বিবেচনাহীন এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে ছাত্রসমাজ আক্রোশে ফেটে পড়ে। ফলে চারিদিকে উল্কার গতিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাঙালি ছাত্রসমাজের নেতারা বুঝতে পারলেন বাঙালি ছাত্রদের চাকুরির প্রবেশদ্বার চিরতরে বন্ধ করতেই এ ঘৃণ্য উদ্যোগ গ্রহণের অপচেষ্টা চলছে। শেখ মুজিবুর রহমান তখনই 'ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করেন।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মাত্র চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট সংগঠনের কমিটিতে শেখ মুজিবও ছিলেন। নইমউদ্দিন এই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। নেতৃত্বস্থানীয় অন্যতম সংগঠক গুলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোহা সংগঠনের নামকরণ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি তোলেন। ঘটনার প্রেক্ষাপটে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শেখ মুজিব তাদের বুঝালেন যে, সরকারের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য মুসলিম শব্দটি এখন প্রয়োজন। যদিও পরবর্তী সময়ে ২১এর ভাষা-আন্দোলনে 'স্টুডেন্টস লীগ' সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সংগঠনের মাত্র চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেই একটি ছাত্রপ্রতিনিধি দল পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়। সেখানে আলোচনায় ভাষা বিষয়ক সমস্যাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলের কাছে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি তা বাস্তবায়ন করেনি। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরিষদ সদস্য জনদেবতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাবে সংশোধনী এনে বলেন 'বাংলাকেও সরকারি ভাষা হিসেবে গণ্য করতে হবে। ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও সরকারি ভাষা করা হোক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্যায়ে তিনি এই দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাব রাখেন। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী ও মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। নন্দিতনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বস্তরে জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। মুজিবের প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তখনই ভাষা-আন্দোলন কমিটি গঠন করা হয়। ভাষা-আন্দোলন কমিটির আহ্বানে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ পূর্ববাংলায় ধর্মঘট ডাকা হয়। ধর্মঘটের সংবাদ পেয়ে মুজিব গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় ছুটে আসেন। তিনি ১০ই মার্চে এ্যাকশন কমিটির সভায় যোগদান করে ভাষা-আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা দেওয়ার জন্য সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান। ১১ই মার্চে এ্যাকশন কমিটির সভায় যোগ দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য শেখ মুজিবসহ ২০০ শত জন সত্যাগ্রহীকে কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে। মুজিব কারাগারের অভ্যন্তরে বাঙালি অবাঙালিদের দ্বন্দ্ব অনুভব করেন। একজন অবাঙালি জেলা প্রশাসকের অস্বাভাবিক আচরণ ও দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ মুজিব প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। ঘটনাটি ক্রমাগত বিরূপ আকারে রূপান্তরিত হয়। কারাবন্দিদের অনেকেই মুজিবকে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু মুজিবের দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতি তাদের নিখাদ আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। হঠাৎ একজন বাঙালি কারারক্ষী এসেই ঘটনার স্রোত অন্যধারায় প্রবাহিত করেন। এ ঘটনা ঘটার পরবর্তী পর্যায়ে ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুজিব উপস্থিত হয়ে আসনে বসেই সভার কার্যক্রম পরিচালনায় বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব করেননি। অথচ ওই সভাস্থলে মুজিবের সভাপতিত্ব করার বিষয় পূর্বনির্ধারিত ছিল না। মুজিব তাৎক্ষণিকভাবে জানালেন এই সংকটময় মুহূর্তে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বাংলাভাষী মানুষের ঐক্য রক্ষার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভাষা-আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তুলতে হবে। নইলে সিংহভাগ মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বৃহত্তর আন্দোলন বিফল হবে। সভাপতি যদি সভা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাপক বিপত্তি ঘটবে। জনগণ দিশের আন্দোলন থমকে যাবে। দূরদর্শী মুজিব ওই সভায় বিস্তৃত আলোচনা বিরতি দিয়ে রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ববাংলার ভবিষ্যৎ পরিণতি ও রাষ্ট্রনায়কের আক্রোশের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেই সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশি অত্যাচারের বাড়াবাড়ি খতিয়ে দেখতে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা। (২) পূর্ববাংলার আইন পরিষদে বাংলাভাষাকে অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করা। (৩) যদি পরিষদ প্রস্তাব দু'টিকে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ

সরকারের মন্ত্রীসভার সকল সদস্যকে একযোগে পদত্যাগ করতে হবে। প্রস্তাব গ্রহণের পরেই মুজিব, সবাই বিধান সভায় চলুন, বলে সভার সমাপ্তি টানেন। উপস্থিত সবাই মুজিবের সাহসী পদক্ষেপ ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেন। সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে এবং বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিকে স্লোগান দিতে দিতে প্রতিবাদমুখর মিছিল এগিয়ে চলে। ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদী মানুষের মিছিল যত এগিয়ে যেতে থাকে পথে পথে ততই বাড়তে থাকে সংগ্রামী মানুষের অংশগ্রহণ। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিধানসভার মোড়ে পুলিশি হামলায় মিছিল ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে খণ্ডযুদ্ধ হয়। আইয়ুব খানের সক্রিয় সহযোগে সামরিকজীন পালিয়ে যান। তিনি ছাত্রদের মুখোমুখি হতে সাহস পাননি। তার ধারণা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যুক্তিতর্কে তিনি নিশ্চিত হেরে যাবেন। এমনকি তাঁর কাছে তার কোনো অজুহাতই ধোপে টিকবে না।

অন্যদিকে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ২১শে মার্চ সমাবেশে এবং ২৪শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ সাহেব বললেন 'আমি আপনাদের সকলের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চাই, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আমাদের দেশে একমাত্র উর্দুই চলবে, অন্য কোনো ভাষা নয়। যে কেউ এ নিয়ে আপনাদের ভুলপথে পরিচালিত করবে, তারা পাকিস্তানের শত্রু।' জিন্নাহ কিন্তু এই ভাষণটি পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় দিয়েছেন। কারণ তিনিও ভালো উর্দুভাষা বলতে পারতেন না। নির্ভীক ভাষাসৈনিক মুজিব শুধু ভাষা-আন্দোলনেই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মীদের উন্নত বেতন কাঠামো এবং নিরাপত্তাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সম্মান ও সমমর্যাদা সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে ছাত্রসমাজসহ শিক্ষক এবং অন্যান্য মহলেও মুজিবের মূল্যায়ন বহুগুণ বেড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অমান্য করায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার

করা হয়। বহিষ্কৃতদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বন্ড দিয়ে শাস্তি মওকুফ করায়। চিরউন্নত শির শেখ মুজিব শর্ত স্বাক্ষরের মাধ্যমে কখনও কারো কাছে করুণা চাননি। তিনি তখন ভাষা-আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার জন্য আন্দোলনের যাবতীয় কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে থেকে পরিচালনা করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে মুজিবকে আবার কারাবরণ করতে হয়। এ কারণে দীর্ঘদিন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন।

১৯৪৯ সালে আরমানিটোলা মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভা হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী। বিরাজমান দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যসংকটের প্রতিবাদে আহূত সভায় মওলানা ভাসানী ছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন শেখ মুজিবসহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ। একদিকে ভাষা-আন্দোলন, অন্যদিকে ক্ষুধার আগুনে দগ্ধ দারিদ্র অবস্থার অবসান ঘটাতে আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। সভা-সমাবেশের শেষে মিছিল নিয়ে বের হওয়ার কারণে মিছিলের অগ্রভাগে থাকা সভাপতি মওলানা ভাসানী, সহ-সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকসহ আরো কয়েকজনকে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে। ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কারাগার থেকে শেখ মুজিব মুক্তি পান। তৎকালীন পূর্ববাংলার সার্বিক পরিস্থিতিতে মুজিব বাইরে থাকলে ভাষা-আন্দোলনকে ক্রমাগত তীব্রতর করে তুলবে, তাতে সরকারের সমস্যা আরও বাড়বে এমন চিন্তা-ভাবনায় মুজিবকে গ্রেফতার করে। তারপর জনসাধারণের প্রচণ্ড চাপের মুখে তাকে মুক্তি দিতেও বাধ্য হয়। ৫২'র ভাষা-আন্দোলনের জাগ্রত চেতনা বুকে ধরে দৃপ্ত পদক্ষেপে মুজিব ক্রমশ সামনে এগিয়ে চলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয় এবং বাংলাদেশ নামে একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। '৫২ থেকে '৭১ অতঃপর ৭৫ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনের বহুমাত্রিক মহৎ কর্মকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ। এমন কী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন সে ভাষণ এখন বিশ্বখ্যাত দলিল হিসেবে জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত।

ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদানের তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক বলেন, 'সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন লেগিসের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে

আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।' এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর সরাসরি ভাষা আন্দোলনে শরিক হন। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমদ্দুন মজলিশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনীকার অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান এই মজলিসকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহুকাজে সাহায্য ও সমর্থন করেন'। তিনি ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বাংলা ভাষার দাবির পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর খাজা নাজিমউদ্দীনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বদান করেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা-আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবি সংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইস্তেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইস্তেহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। ঐতিহাসিক এই ইস্তেহারটি একটি ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার- ঐতিহাসিক দলিল।' উক্ত পুস্তিকাটি ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই ইস্তেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। ১৫০নং মোগলটুলির 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' ছিল সে সময়ের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মিলন কেন্দ্র। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা বাংলা ভাষাসহ পাকিস্তানের অন্যান্য বৈষম্যমূলক দিকগুলো জাতির সামনে তুলে ধরেন। ভাষা-আন্দোলনের পক্ষের কর্মীবাহিনী এখানে নিয়মিত জমায়েত হতো এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার নানা কর্ম-পরিকল্পনা এখানেই নেয়া হতো। শেখ মুজিব, শওকত আলী, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন এই ক্যাম্পের প্রাণশক্তি।

১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে শেখ মুজিব কারাবন্দি ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকলেও জেলে বসেও নিয়মিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন- '১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।' ভাষাসৈনিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন। 'শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়েছেন।'

জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। সোহরাওয়ার্দী এই অবস্থানে দৃঢ় থাকলে ভাষা-আন্দোলনে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারত। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এই মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, ' সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছর জুন মাসে আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচি যাই এবং তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি।

১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকী পালনেও বঙ্গবন্ধুর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সেদিন সব আন্দোলন, মিছিল এবং নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে শেখ সাহেব সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। পরবর্তীকালেও শেখ মুজিব বাংলাভাষা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অধিকারের সেই একই দাবি ও কথাগুলো আরো বর্ধিত উচ্চারণে জাতির সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাভাষায় ভাষণ দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন অমলিন হয়ে থাকবে। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ। ১৯৫৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানান। একই সালের ৭ই ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত জাতীয় ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গে আমরা সরকারি ভাষা বলতে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝি না। কাজেই খসড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের ভাষা সম্পর্কে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হুকুম তলবে করা হয়েছে। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্নে কোনো ধোঁকাবাজি করা যাবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি এই যে, বাংলাও রাষ্ট্রীয় ভাষা হোক। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের আইন সভার অধিবেশনেও তিনি

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসের কাজে বাংলাভাষা প্রচলনের প্রথম সরকারি নির্দেশ জারি করেন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জারিকৃত এক আদেশে বলা হয়, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথি লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।

১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমিতে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু হবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনোদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, এভাবেই অগ্রসর হতে হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মূল নায়ক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভাষা-আন্দোলনেরই সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি" (দৈনিক সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫)। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। আন্দোলনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্থপতির ভূমিকা পালন করে আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। 'বাংলাদেশ' নামের এ ভূখণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বীকার করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু কীভাবে ভাষা-আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক ফুলতাসীর মামুন রচিত 'বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে আরও অনেকের সাথে অন্নদাশঙ্কর রায় ঢাকা আসেন। কথা হয় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। অন্নদাশঙ্কর রায় লেখেন। 'শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটি প্রথম কবে আপনার মাথায় এল?' 'শুনবেন?' তিনি (বঙ্গবন্ধু) মুচকি হেসে বললেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সুহরাবর্দী (সোহরাওয়ার্দী) সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালীর এক দেশ।... দিল্লী থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজী নয় তাঁদের প্রস্তাবে।... তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা।... হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলাভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞেস করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে, পাক বাংলা। কেউ বলে, পূর্ববাংলা। আমি বলি, না বাংলাদেশ। তারপর আমি স্লোগান দিই, 'জয়বাংলা'।... 'জয় বাংলা' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জয় বা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।'

৪ঠা মার্চ ঢাকা জেলা গোয়েন্দা তথ্যে বলা হয়, 'শেখ মুজিবুর রহমানসহ যারা মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে কাজ করেছে তারাই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে লিফলেট ছড়াচ্ছে।' [ডসিউমেন্ট-১, পৃষ্ঠা ৭]

৩রা মার্চ গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের সম্মেলনে বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে কথা বলেন। গোপন নথিতে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে: Sheikh Mujibur Rahman & other leaders delivered speeches in a meeting of the students over the Language Movement, which was held at the premises of the court mosque, Gopalganj on 3.3.1948. [ডসিউমেন্ট-১, পৃ ৩৪০]

[DIO, IBEB, Dacca submitted a report containing the particulars of the members of the provisional organizing committee of EPMSL including the name of Sheikh Mujibur Rahman, who was one of the signatories of the leaflet which advocated Bengali to be the State Language of Pakistan. (Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-7)]

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘট সফল করতে ১লা মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে প্রচার মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, সম্পাদক তমদুন মজলিশ, শেখ মুজিবুর রহমান, কাউন্সিলের সদস্য, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ, নঈমুদ্দীন আহমদ আহ্বায়ক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, এবং আবদুর রহমান চৌধুরী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতা জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিবৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। এই ধর্মঘট পালনের আগের রাতে অর্থাৎ ১০ই মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে দিনটির কর্মসূচি নিয়ে একসভা বসে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে:

Secret information was received

on 12.3.48 that the subject (Sheikh Mujibur Rahman) along with others took part in the discussions held at Fazlul Haq Hall on 10.3.48 and gave opinion in favour of violating section 144 cr.p.c. on 11.3.48.

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পালিত এই ধর্মঘটটি ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সফল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হন। পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে:

[IB report on Sheikh Mujibur Rahman, who was arrested on 11.3.1948... This subject (Sheikh Mujibur Rahman) was arrested on 11.3.48 for violating the orders...He took very active part in the agitation for adopting Bengali as the State language of Pakistan, and made the propaganda at Dacca for general strike on 11.3.48 on this issue. (Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-7)]

দিনটি নিয়ে 'কারাগারের রোজনামচা'য় বঙ্গবন্ধু বলেন: 'প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (এখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ) ও তমদ্দুন মজলিশের নেতৃত্বে। ঐদিন ১০টার আমি, জনাব শামসুল হক সাহেবসহ প্রায় ৭৫ জন ছাত্র গ্রেপ্তার হই এবং আবদুল ওয়াদুদ-সহ অনেকেই জীবণভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়।' [কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ২০৬]

ভাষাসৈনিক অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' গ্রন্থে লিখেছেন: 'আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ

হতে ১০ই মার্চ ঢাকায় আসেন।' ১১ই মার্চের হরতাল কর্মসূচিতে যুবক শেখ মুজিব এতটাই উজ্জীবিত হয়েছিলেন যে, এ হরতাল ও কর্মসূচি তার জীবনের গতিধারা নতুনভাবে প্রবাহিত করে। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, 'স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই তাঁর প্রথম গ্রেপ্তার।' শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৬ই এপ্রিল গোপালগঞ্জে সর্বাত্মক হরতাল ডাকা হয়। এ নিয়ে ওয়া এপ্রিল গোয়েন্দাদের দেওয়া এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৫ই মার্চ গোপালগঞ্জে প্রায় চারশ' ছাত্র বিক্ষোভ করে। তারা সেই বিক্ষোভ থেকে ১৬ তারিখে শহরে দিনব্যাপী হরতাল ডাকে। তারা শেখ মুজিবুরের মুক্তির দাবিতে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দেয়। [ডসিউমেন্ট-১, পৃ ৮-৯]

[Extract from WCR of SP office, Faridpur, where it was mentioned that a complete hartal was announced at Gopalganj town on 16.3.1948 as a mark of protest against the arrest of Sheikh Mujibur Rahman. (Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-8)]

এই অংশে বিবৃতির নিচে 'সাইড নোট' লিখে ফের বলা হচ্ছে: Was Muzibar Rahman arrested in Dacca city in connection with the language controversy? Why did the Gopalganj students take up his cause? Ask Faridpur to clarify the later point., Sd. S.K.G, 16/17.4.38

১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠতলার ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ব-বাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ লিখেছেন: 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেলা দেড়টায় সভা শুরু হলো। মুজিবুর

রহমান সভাপতিত্ব করলেন। সংশোধনীগুলি গৃহীত হলো এবং অলি আহাদের মাধ্যমে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হলো। [তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-১৯৪৮, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩০]

বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ পাঠে জানা যায় '১৬ই মার্চ আবার বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় সভা হয়, আমি সেই সভায় সভাপতিত্ব করি। আবার বিকালে আইনসভার সামনে লাঠিচার্জ হয় ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। প্রতিবাদের বিষয় ছিল, 'নাজিমুদ্দীন সাহেবের তদন্ত চাই না, জুডিশিয়াল তদন্ত করতে হবে।' [কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা ২০৬] ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে মঈনুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে একসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ অলি আহাদ। '১৭ তারিখ এ দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ১৭ই মার্চ সন্ধ্যার পর ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'র সভা অনুষ্ঠিত হয়, এই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি এ সভার উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৯ সালের ৯ই জানুয়ারি গোপন দলিলের ২৭ নাম্বার স্লিপে দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কার্যক্রমের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ ও চালু করার বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর একাধিক ভাষণে জোর দিয়েছেন।

[Addenda to the Brief history of Sheikh Mujibur Rahman, sent from SP, DIB Khulna to IBBB, Dacca, where a number of political activities of Sheikh Mujibur Rahman were mentioned. It was also reported that he delivered speeches demanding to adopt Bengali as court language...(Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-66)]

গোপন দলিলের ৪০ নম্বর স্লিপে উল্লেখ আছে, ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ সদরঘাট থেকে প্রায় দুইশজন ছাত্রের অংশগ্রহণে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, দবিরুল ইসলাম ও কল্যাণ দাস গুপ্ত নওয়াবপুর রোড হয়ে দুপুর ১২ টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে আসেন। তার এক ঘণ্টা পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা জমায়েত হয়।

গোপন নথিতে প্রতিবেদনটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এভাবে। Report of a procession brought out Sheikh Mujibur Rahman at Nowabpur road & Sadarghat area on 12.3.1949. A meeting of students held at Dacca University ground. Nadira Begum & other student leaders spoke in the meeting. All of them delivered their speeches in support of Bengali as state Language... ...[Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-101]

গোপন নথির ১৫৪ নাম্বার স্লিপে ১৯৪৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর গোয়েন্দা নজরদারির সারবস্তু তুলে ধরা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে: 'He (Sheikh Mujibur Rahman) took a very active part in the agitation for adopting Bengali as the State language of Pakistan, and made propaganda at Dacca for general strike on 11.3.48, on this issue. On 11.3.48 the subject was arrested for violating orders under section 144 Cr. P.C. [Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-319]

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আজও আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তা আসবে সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে, চরম আশ্বাসের কথা শোনাবে পূর্ব দিগন্ত থেকেই।' বাঙালির ভাগ্যাকাশে সেই ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে বাঙালির কাছ থেকে ভাষার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল সংখ্যালঘু জনগণের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু তাদের সেই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মহাকালের মহামানব স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছেন। লাখো শহিদের রক্তে রঞ্জিত '৫২, '৭১, '৭৫ এর সর্বাধিক মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাস বিকৃতির মহোৎসবের মাধ্যমে মুজিবকে আড়াল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীনতার শীর্ষবিন্দুস্পর্শী বহুমাত্রিক বঙ্গবন্ধুর অমর অক্ষর কীর্তিতে, সুমধুর স্মৃতিতে, রক্তসিক্ত ইতিহাসে বাঙালির হৃদয়াসনে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন বিন্দ্র শ্রদ্ধায় পুষ্পিত ভালোবাসায়। তিনি স্মরণীয় বরণীয়। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক। 'জয় বাংলা'

লেখক: কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক

শহিদ মিনার : বাংলাদেশ

সোহরাব পাশা

মাঝরাতে হরিয়াল ডাকে,
আর্তনাদে কেঁপে ওঠে দুঃস্বপ্ন পীড়িত- অবিনাশী
রাত্রির জীবন;

বধ্যভূমির শীতার্ত বাতাসে কাঁপে নীল শহর
হলুদ ঘাসের ঠোঁট
মানুষ ভুলে যায় পথের সংস্কৃতি
পুবের আকাশের রচনা,
লাল ভোর;

মৃত্যু কেড়ে নেয় বেদনার তত্ত্বভাষা
সঙ্কল্পের মুদ্রা
দীর্ঘস্বপ্ন-দীর্ঘশ্বাস;

মানুষ কী ভুলে যাবে- কীভাবে বধ্যভূমির ভেতর দিয়ে
বীভৎস আগুনের ভেতর দিয়ে ভাঙা, নগ্ন
পা'
শহিদ মিনারের বিষণ্ণ ছায়ায়
হেঁটে এসেছে বাংলাদেশ।

একুশের কবিতা

পারভেজ বাবুল

একুশ মানেই দুঃখ শোকের রক্তে লেখা ইতিহাস
একুশ মানেই ভয় হারানো কোটি বাঙালির প্রাণোচ্ছ্বাস।

দেখো দেখো ওই ছেলেহারা কতো দুখি মা কাঁদে
আকাশ বাতাস কাঁদে করুণ আর্তনাদে
দেখো মা শহিদ মিনারে
হাসছে তোমার রফিক শফিক ফুল তাই ছড়ায় সুবাস।

ফুলে ফুলে আজ ভরেছে প্রাণের শহিদ মিনার
একুশ আমার একুশ সবার সারা দুনিয়ার
আজ বর্ণমালা বাংলা আমার
বাংলা নামের দেশটি আমার প্রভাতফেরির ফাল্গুন মাস।

একুশ মানেই দুঃখ শোকের রক্তে লেখা ইতিহাস
একুশ মানেই ভয় হারানো কোটি বাঙালির প্রাণোচ্ছ্বাস।

বাঙলা ভাষার বসন্ত

রীনা তালুকদার

আসন্নজ প্রাকৃতিক বৃক্ষের নানান সুঘ্রাণে
মুকুলিত ফলদ বৃক্ষরাজি
শাখায় পাতায় হলুদিয়া পাখির আসঙ্গ ডেটিং
পত্রহীন শিমুলের ডাল জুড়ে বাকল ফোড় ফোড়
ফুঁড়ে ফুঁড়ে শিশু ফুলের সমাহার
কাঁঠালের মুচিতে চালতার ঝাঁঝ মাখামাখি
আ...হা ...
কৃষ্ণচূড়ার বেদম কাটাকাটি রঙে
কিশোরী কৃষ্ণচূড়ার সারা অঙ্গে
হাসছে অ আ ক খ
বাংলা ভাষার বাসন্তিক বাতাস
বৈরাগ্য বাউলের একতারায় ধরেছে তান
মধুর সেই তানে বেজে ওঠে ...
"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি...।"

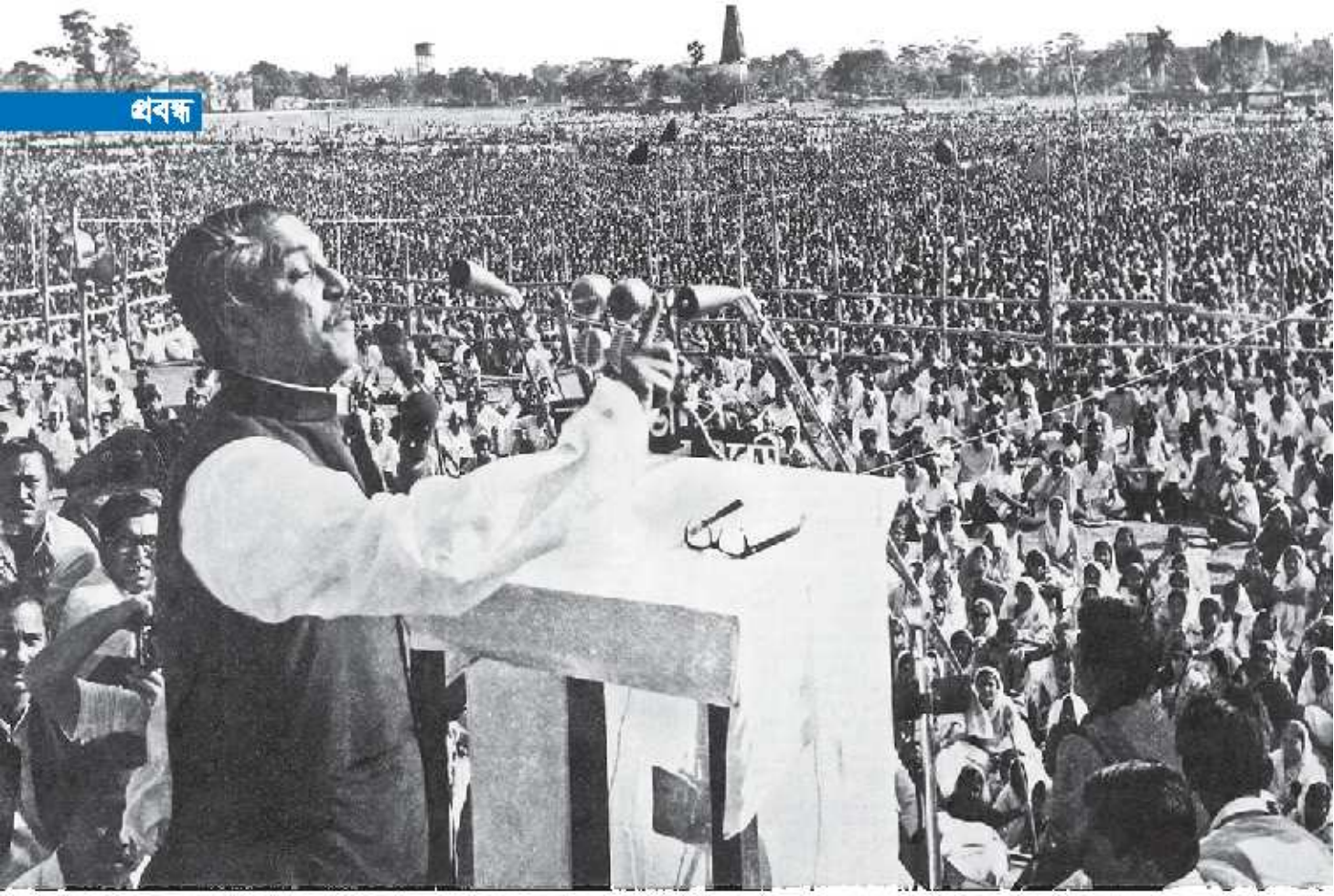

বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় সেই ভাষণ- যা স্বাধীনতা এনে দেয়

মোহাম্মদ শাহজাহান

‘৭ই মার্চ সকালে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। এই অবস্থায় জনসভামুখী পাকিস্তানি দস্যুদের ট্যাংক, কামান, মেশিনগানকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ তাঁর ১৭/১৮ মিনিটের এক অবিস্মরণীয় ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দেন। গত ৫ দশকে এই ভাষণ নিয়ে অসংখ্য মানুষ লিখেছেন। মুজিবের ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই কালজয়ী ভাষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইচ্ছে করলে বড় আকারের কয়েক খণ্ড বইও লেখা যাবে।’

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ৭ই মার্চ অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন অর্থাৎ ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রোববার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৭/১৮ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করেন। সেদিনের সেই ভাষণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন সাংবাদিকের মতে, ‘প্রকৃতপক্ষে ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি

বাক্য, প্রতিটি চরণ নিয়ে এক-একটি আলাদা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে।' ঐতিহাসিকরা একদিন লিখবেন, '৭ই মার্চ থেকে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে এবং মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।' সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী মুজিব ঐদিন পাকিস্তানি দস্যুদের কামান-বন্দুক-মেশিনগান গুলি-বেয়নেট উপেক্ষা করে সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ বাহিনী, বেতার-টেলিভিশন কর্মকর্তাসহ জনগণকে লক্ষ্য করে বজ্রকণ্ঠে বলেন, 'আপনারা শুধু আমার নির্দেশ পালন করবেন।' পাকি সরকারকে খাজনা, ট্যাক্স দিতে নিষেধ করেন। সামরিক সরকার বহাল থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তখন সবকিছু চলছিল, অফিস-আদালত ও ব্যবসা, কলকারখানায় কাজ চলছিল না। স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধানের মতোই শেখ মুজিব ৭ই মার্চ ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেও পরবর্তীকালে বলেছেন, ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো বাকি ছিল না। ১৯৭৪-এর ১৮ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু বলেন, '৭ই মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐদিনই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কারভাবে বলা হয়- 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' বিবিসি'র সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেছেন, ৭ই মার্চ সন্ধ্যার পর ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। এখন তোমাদের দায়িত্ব এই স্বাধীনতা রক্ষা করা।' ইংরেজিতে তিনি বলেন, 'Bangladesh is now independent. Go and preserve it.' বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ জামাতা ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে লিখেছেন, "রাতে খাবার টেবিলে পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানিরা আমাকে যে কোনো সময় মেরে ফেলতে পারে। আজ থেকে তোমরা দু'বেলা আমার সাথে খাবে।' বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য থেকে এটাই বোঝা যায়, তাঁর আজন্ম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করা। সেই স্বাধীনতার ঘোষণা আজ তিনি দিয়েছেন। দেশ আজ স্বাধীন। কাজেই শত্রুরা এখন তাঁকে মেরে ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক।" পাকিস্তানি সামরিক চিন্তাবিদ জেনারেল কামাল মতিনউদ্দিন তাঁর লেখা 'দ্যা ট্র্যাজেডি অব এরর' বইয়ে লিখেছেন, 'যে কোনো দিক থেকেই ৭ই মার্চ ছিল মুজিবের দিন। পুরো পরিস্থিতি ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁর বক্তব্যে ওইদিন গাছ-পাথরও আন্দোলিত হয়েছিল। জনগণের প্রাণচাঞ্চল্য ছিল উদ্দীপনাময়। প্রকৃতপক্ষে ঐদিনই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।'

৭ই মার্চ বাঙালি জাতির হাজার বছরের একটি কাঙ্ক্ষিত দিন। এই দিনটির জন্য শেখ মুজিব বাঙালি জাতিকে তিলে তিলে তৈরি করেন। ১৯৬৬ সালে মুজিব ৬-দফা দাবি পেশ করেন। তিনি জানতেন, পাকি সামরিক চক্র ৬-দফা দাবি মানবে না। তিনি এটাও জানতেন, ৬-দফা একদিন এক দফায় পরিণত হবে। মাত্র ৪ বছরে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয় ৬-দফা। আর এ জন্যই সত্তরের নির্বাচনে এদেশের প্রায় শতভাগ মানুষ মুজিবের নৌকায় ভোট দেন। ১লা মার্চ ১৯৭১ পাকি সামরিক চক্র ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে দিলে পূর্ব বাংলায় জনগণ রাজপথে স্লোগান দেয়- 'দুয়ারের মুখে লাথি মার- বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' একজন পাকিস্তানি জেনারেলের মতে, ১লা মার্চই পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সভায় অনির্ধারিতভাবে উপস্থিত হয়ে মুজিব ঘোষণা করেন, 'আমাকে হত্যা করা হলেও আপনারা মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।' তিনি বলেন, 'যতদিন আমার দেশ মুক্ত না হবে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো, কেউ দিবে না।' পল্টনের সভায় শেখ মুজিবকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা (জাতির পিতা) ঘোষণা করা হয়।

আসলে সত্তরের নির্বাচনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি। সত্তরের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার ৯৮ শতাংশ জনগণ বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দেন। আসলে ওই নির্বাচনই প্রমাণ করে দেয় পূর্ব বাংলার একমাত্র নেতা হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র শেখ মুজিবের- অন্য কোনো নেতার নয়। আর এভাবেই বঙ্গবন্ধু মুজিব বাংলার মুকুটহীন সম্রাট পরিণত হন।

জাতীয় পরিষদের ৩১৩ (৩০০+১৩ মহিলা) আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন পেয়ে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক চক্র ৩রা মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন ১লা মার্চ দুপুরে আকস্মিকভাবে মুলতুবি করে দেয়। ইয়াহিয়ার ঘোষণা মেনে নিল না বাংলার মানুষ। লাখো মানুষ মিছিল করে যায় বঙ্গবন্ধুর কাছে। শেখ মুজিব ২রা মার্চ ঢাকায় ও ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে বলেন, 'লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।' পাকিস্তানি জে. রাও ফরমান আলী পরবর্তীকালে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর সমগ্র বাঙালি জাতিই এবার যুদ্ধের পথে নেমে গিয়েছিল। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের ভাঙন ধরেছিল।'

২রা মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাঙালি আর নির্যাতিত হতে রাজী নয়। তারা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।' ওইদিন বঙ্গবন্ধু ঘোষিত কর্মসূচিতে বলা হয়, ৩রা মার্চ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে ৬টা-২টা হরতাল থাকবে। ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসভায় তিনি পরবর্তী কর্মসূচি দেবেন। সেনাবাহিনীর গুলিতে কয়েকজন নিহত হওয়ার পর একই দিন অপর এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারকে বেআইনি ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। ৩রা মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা শোভিত মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে খাজনা ট্যাক্স না দেয়ার নির্দেশ দেন। এই

নির্দেশটি থেকেই কি বুঝা যায় না, তখন থেকেই বাংলাদেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল শেখ মুজিবের হাতে। পল্টনের সভায় কবিতজন 'আমার সোনার বাংলা' গানকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করা হয়। ২রা মার্চ সেনাবাহিনীর গুলিতে বেশ কিছু মানুষ হতাহত হয়। হাজীগের সভায় হত্যার জবাবে বঙ্গবন্ধু পাল্টা হত্যার হুমকি দিয়ে বলেন, 'মনে রাখবেন, ৭ কোটি মানুষকে গুলি করে মারা যাবে না। আর যদি মারেন, তাহলে আমরাও মারবো।' ৪ঠা মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু জনগণকে ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'চরম ত্যাগ স্বীকার ছাড়া কোনোদিন কোনো জাতির মুক্তি আসেনি।'

এরই মধ্যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বুঝে গেছে পাকিস্তানের অস্তিত্ব এখন শেখ মুজিবের ওপর নির্ভর করছে। অর্থাৎ একমাত্র মুজিবের পক্ষেই পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব। ৪ঠা মার্চ রাতে পিন্ডি যাওয়ার আগে জে. রাও ফরমান আলী ৩২ নম্বরের বাসভবনে গিয়ে জননায়কের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে চান, 'প্লিজ বলুন, পাকিস্তানকে রক্ষা করা কি সম্ভব?'

৫ই মার্চ ঢাকা থেকে 'দি টাইমস'-এর সংবাদদাতা পল মার্টিন প্রেরিত সংবাদে শেখ মুজিবকে কার্যত বিদ্রোহী বাংলার শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ৭ই মার্চ যতই এগিয়ে আসছিল পাকিস্তানি শাসকবর্গের ভয়-ভীতি ততই বাড়ছিল। বাংলার মানুষ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তখন একেবারেই মরিয়া। ঢাকাসহ সারা দেশে মিছিল-মিটিং-সমাবেশে দাবি একটাই- 'আর পাকিস্তানিদের সাথে একঘরে থাকা যাবে না।' বঙ্গবন্ধুকে নমনীয় করার জন্য ৬ই মার্চ জে. ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। এরপর ওই দিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া টেলিফোনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন বঙ্গবন্ধু মুজিবের সঙ্গে। সকাতর অনুরোধ জানিয়ে ইয়াহিয়া বাংলার মানুষের জন-গণ-মন-অধিনায়ক শেখ মুজিবকে বলেন, 'প্লিজ, এমন কোনো পদক্ষেপ নেবেন না, যেখানে থেকে আর ফিরে আসা যাবে না।' এরপরেও সামরিক জান্তার ভীতি কমছিল না। ইয়াহিয়া খান কঠোর পদক্ষেপ হতে বিরত থাকার কাকুতি-মিনতি জানিয়ে টেলিপ্রিন্টারে মুজিবের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকারের গণসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল সিদ্দিক সালিক-এর গ্রন্থে এসব ঘটনাবলী বিস্তারিত লিপিবদ্ধ রয়েছে। সালিকের বক্তব্য অনুযায়ী শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে ইয়াহিয়া ওই বার্তায় বলেন, 'অনুগ্রহ করে কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শীঘ্রই ঢাকা আসবো। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার আকাঙ্ক্ষা ও জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আপনাকে এমন কিছু দেবো, যা আপনাকে ৬-দফা থেকেও বেশি খুশি করবে।'

৬ই মার্চ শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে একজন ব্রিগেডিয়ার ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে মুজিবের হাতে ইয়াহিয়ার বার্তাটি পৌঁছে দিয়ে আসেন। একদিকে ইয়াহিয়া খান টেলিফোনে কথা বলে টেলিপ্রিন্টারে বার্তা পাঠিয়ে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিরত থাকার জন্য কাকুতি-মিনতি করেন, অন্যদিকে ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। ঢাকার জিওসি জে. খালিদ হোসেন রাজা স্পষ্ট করেই শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেন, '৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সামরিক বাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে জনসভায় আক্রমণ চালাবে। এক কথায় ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে, যেখানে শাসন করার ও শাসিত হওয়ার কেউ থাকবে না। প্রয়োজনে বিমান থেকে জনসভায় হামলা করা হবে।' উল্লেখ্য, ঢাকা সেনানিবাস থেকে ওই মার্চের জনসভাকে লক্ষ্য করে কামান বসানো হয়েছিল। সামরিক বিমান ওইদিন জনসভার ওপর দিয়ে বারবার টহল দিচ্ছিল। অর্থাৎ শেখ মুজিব ওইদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তান সামরিক চক্র জনসভায় গুলি চালাতো। এতে হাজার হাজার নয়- লাখো মানুষ নিহত হয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকতো না।

শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তানি জান্তা বলতে পারতো- 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছে, সেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে।' সম্ভবত ১৯৭০ সালে বা তার আগে জাতিসংঘের একটি সিদ্ধান্ত ছিল কোনো রাষ্ট্রের সংহতিবিরোধী কর্মকাণ্ড বিশ্ব সংস্থা সমর্থন করবে না। সিদ্দিক সালিক তাঁর 'Witness to Surrender' গ্রন্থে ৭ই মার্চের পূর্বরাতের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা বঙ্গবন্ধু বা তাঁর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কিছু জানা হয়নি। সালিক লিখেছেন, "৬ই মার্চ রাত ২টায় সেনানিবাসের বাসায় গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার জিওসিকে ঘুম থেকে তোলে। তার সাথে ছিল শেখ মুজিব প্রেরিত দু'জন আওয়ামী লীগার। মুজিবের দূতরা বলেন, শেখ সাহেব চরমপন্থীদের কাছ থেকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছেন। তারা তাঁকে জনসভায় একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাদেরকে উপেক্ষাও করা যাচ্ছে না। তাই তাঁকে সামরিক হেফাজতে নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন।" জবাবে জিওসি বলেন, 'আমি নিশ্চিত' কীভাবে চাপ প্রতিহত করতে হয়, মুজিবের মতো একজন জনপ্রিয় নেতা তা ভালোভাবেই জানেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে কিছু করানো যাবে না। তাঁকে বলবেন, আমি রেসকোর্সের পাশেই থাকবো। এও বলে দেবেন, পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কথা বললে তাৎক্ষণিকভাবে আঘাত হানা হবে। বিদ্রোহীদের হত্যার জন্য ট্যাংক, কামান, মেশিনগান সবই মোতায়েন করবো।" সালিকের লেখা এই কাহিনি কতটুকু সত্য জানি না। তবে এমন হতে পারে বঙ্গবন্ধু দূত পাঠিয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মন-মানসিকতা ও প্রস্তুতি যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁকে ঐ পরিস্থিতিতে সামরিক হেফাজতে নেয়ার মুরোদ যে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের ছিল না, বঙ্গবন্ধু তা বেশ ভালোভাবেই জানতেন।

সত্তরের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর পাকিস্তানের ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টো চক্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্বনেতায় পরিণত হয়ে যান।

শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। ৬ই মার্চ লন্ডনের দি টাইমস-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, 'প্রতিবাদমুখর পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হওয়ার দাবি ঘণ্টায় ঘণ্টায় তীব্রতর হচ্ছে।' একই দিন করাচী থেকে পিটার হ্যাজেলহার্স্ট এক রিপোর্টে জানান, 'পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। ৭ই মার্চ তিনি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন অথবা সংসদ ডেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের যোগদানের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে ৬ই মার্চ খোদ ওয়াশিংটনে কিসিঞ্জার চক্র আলাপ-আলোচনা করে। মার্কিন সরকারের অবমুক্ত দলিলের ওপর ভিত্তি করে ২০০৮ সালে প্রকাশিত সাংবাদিক মিজানুর রহমান খানের '১৯৭১: আমেরিকার গোপন দলিল' গ্রন্থে এসব তথ্য রয়েছে। বইটির ১৩৩ পৃষ্ঠায় '৭ই মার্চের ভাষণ শুনতে ওয়াশিংটনের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা' শীর্ষক লেখায় বলা হয়, "মুজিবের সভার ১ দিন আগে ৬ই মার্চ ওয়াশিংটন সময় ১১টা ৪০ মিনিটে শুরু হওয়া বৈঠকে কিসিঞ্জার স্টেট ডিপার্টমেন্টের পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে বাঙালি নেতার সম্ভাব্য ভাষণ নিয়ে প্রায় ৪০ মিনিট আলোচনা করেন। কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের ঐ বৈঠকে শেখ মুজিব ভাষণে কি বলবেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন কিনা, তিনি যদি আমেরিকার সহযোগিতা চান, তখন তারা কি করবেন এসব নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত জিনেটাকার জ্যান হোলেন বলেন, 'আগামীকাল মুজিবের সামনে সম্ভবত তিনটি বিকল্প খোলা। এক. একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা; দুই. এর চেয়ে কম কিছু- সম্ভবত দুটি সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানানো; তিন. ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া আহুত অধিবেশনে যোগ দিতে রাজী হওয়া।" পাকিস্তানের একটি প্রদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের একজন নেতা একদিন পর কি ভাষণ দেবেন, তা নিয়ে যখন পৃথিবীর শক্তিমান দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আগাম আলোচনা হয়, তাতেই বুঝা যায় শেখ মুজিব কত বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। এসব থেকে বুঝা যায়, ৭ই মার্চের মুজিবের ভাষণ নিয়ে পাকিস্তান শুধু নয়, তাদের মুরুব্বী- বিশ্বের মোড়ল দেশ আমেরিকাও ছিল শংকিত। কারণ তারা জানতেন, মুজিব ওই মুহূর্তে এতোটাই ক্ষমতাবান যে তাঁর একটি কথাতেই পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে। অথচ একজন খলনায়ককে স্বাধীনতার তথাকথিত ঘোষক বানাতে এই বাংলাদেশেরই একশ্রেণির বেইমান বিগত ৫ দশক ধরে জান কোরবান করে ফেলছে।

৭ই মার্চ সকালে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। এই অবস্থায় জনসভামুখী পাকিস্তানি সন্ত্রাসের ট্যাংক, কামান, মেশিনগানকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ তাঁর ১৭/১৮ মিনিটের এক অবিস্মরণীয় ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দেন। গত ৫ দশকে এই ভাষণ নিয়ে অসংখ্য মানুষ লিখেছেন। মুজিবের ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই কালজয়ী ভাষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইচ্ছে করলে বড় আকারের কয়েক খণ্ড বইও লেখা যাবে।

কারো কারো মতে, ৭ই মার্চ ছিল শেখ মুজিবের জীবনের সবচেয়ে সংকটময় দিন, কঠিন দিন। তিনিই স্বাধীনতার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। জনগণ চেয়েছিল ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যেন সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আর স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তানি সৈন্যরা কামান-বন্দুক চালিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই হাজার হাজার লোককে হত্যা করতো। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে সাহসের বরপুত্র দূরদর্শী মুজিব তাঁর ভাষণের শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাংলার জনগণ ও শত্রু পাকিস্তানি সামরিক উভয়েই বুঝে গেল স্বাধীনতাই মুজিবের একমাত্র গন্তব্য। আর এ জন্যই প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেছেন, '৭ই মার্চের ভাষণ এতটাই

কৌশলী ছিল যে, শেখ মুজিব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন অথচ তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি।' সবশেষে মোহাম্মদ শাহজাহান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: স্বাধীনতার মহাকাব্য' (বাংলা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ৩১ মে ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৪) গ্রন্থে বরেণ্য লেখক ও বুদ্ধিজীবী হাসনাত আবদুল হাই এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ লেখার ইতি টানতে চাই। তিনি লিখেছেন, '৭ই মার্চের বক্তৃতাকে শুধু ঐতিহাসিক বলা হলে যথেষ্ট হবে না। পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো রাজনীতিবিদ বা গণনায়ক কখনো এমন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে, তেজোদীপ্ত আবার এবং সময়োপযোগী করে বক্তৃতার উদাহরণ নেই। শুধু বঙ্গবন্ধুর অতীত সব বক্তৃতা নয়, আরো অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নেতার বক্তৃতাকে অতিক্রম করে গেছে ওই বক্তৃতা। তুলনায় কাছে আসতে পারে এমন কোনো বক্তৃতার কথাও মনে করা যায় না, এতটাই বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী ছিল তাঁর সেই বক্তৃতা।... তাৎক্ষণিকভাবে জনসভায় দাঁড়িয়ে অথবা অব্যবহিত আগে তাঁকে ঠিক করতে হয়েছে কী বলবেন। তাঁর সময় ছিল না ভাবনা-চিন্তার, তদুপরি ছিল অসম্ভব চাপ। আর এ জন্যই রেসকোর্সের জনসমুদ্রের সামনে দেয়া বক্তৃতাই অবিস্মরণীয়। পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে চিরকাল।"

লেখক: তাঁর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষক; সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা

জেগে ওঠা কণ্ঠস্বরে

এস এম তিতুমীর

শান্ত রাতের আকাশ। শিশির ঝরা ভোরে জেগে ওঠা ঘাস
কথা বলে পায়ের পরশে। নিঃসীম নীল দৃষ্টির তলে অকস্মাৎ
বেজে ওঠে রক্তকলিকা, উদ্‌পিরনের লাভার চাপ-চাপ বোধ
ফিরে যায় আত্মপিরির কাছে। মানুষের ভিড়ে মানুষ আর
আমার ভিড়ে আমি; দাঁড়াই যন্ত্রণার পাশে। মথিত মানবতা, তখন সকাশে
কাতরতার ধ্বনি তুলে পেরোতে চায় হাবিয়া জ্বালা; অনল নদী

যদি বাধা থাকে তন্ত্রী কোনো কূলে; ভুলে বেভুলে দিগ্‌বিদিক ছুটে
বোতলবন্দি মাছির মত। আকুতি সবার শত-সহস্র শত
আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে, পাহাড়-পর্বত কাঁপিয়ে, সাগর-নদী ডিঙিয়ে
এক নাম: তখন ছড়িয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার ধাম। মুক্তির ত্রাতা রূপে
ঝরে পড়লো এক তেজদীপ্ত অবিনাশী বিশ্বাস; অমৃত স্লোগান
-'জয় বাংলা'

ভেঙে পড়লো বন্দিদশার তন্ত্রী শিকল। ঢেউ তুললো তেরো'শ নদীর স্রোত
উত্তরে হিমবাহ, দক্ষিণে সুন্দরবন, পূবে জাফলঙ আর পশ্চিমে রণ-ঝড় বহমান
কোথায় জল্লাদ-শাসনের থাবা, বিজাতীর রক্তের বীজ! কোথায় তারা:
জেগেছে নিশ্চয় কম্পিত হুঙ্কার বাঙালির, বিশ্ব। পরাধীন বাংলার আর্তনাদ
বিবেক তখন অস্থির, মুক্তির যন্ত্রণায় কাতর
একটা খোলা মাঠ, লাখো জনতার ভিড়। হাতে বাঁশের লাঠি আর অন্তরে
অদম্য বিশ্বাস। সাহসের বহতা ধারার ঐশ্বরিক শক্তি 'তোমাকে আসতেই হবে এই বাংলায়'
থেমে আছে মাঠের পর মাঠ, পাতালের শরীর, নিঃশ্বাসের পর নিঃশ্বাস
প্রশ্বাসের শব্দহীন আয়তনে শুধু বেড়ে ওঠে মানুষের চল, মানুষ আর মানুষ!
জনবে এক বজ্রবাণী- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'
হিংস্রতার দুয়ারে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে বাজতে থাকে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় শত্রুর ডেরা
আমরা তখন মুক্তির কাছাকাছি। বাংলার পাখির গান তখন সুর তুলে বিশ্বময়

বাঙালি আমি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুখ চোখের আর্শিতে
ইতিহাস লেখা হলো দেহের রক্তে। জীবনের দামে ফুটলো হাজার ফুল
ঢাকলো তাদের কবার চাদর যারা চেয়েছিলো মুক্তির বিপরীত ফল
'বঙ্গবন্ধু' আস্থা আর বিশ্বাসে অবিচল। হৃদয় যার সমগ্র বাংলাদেশ
খুশির কাছে একটুও না আপন্ন পায় স্বাধীনতার ভালোবাসা, দয়ার বিন্দু
একটুও না পায় মর্মব্যথা। বাঙালীভূমির সব ধুলিকণা জমাট করক বুলেটের ঘায়ে
সোজাইক সিঁড়ি স্থির, অনড়। ভুলে গেছে অগ্রসরতার হিসেব পৃথিবী মাঝে।
পরাধীনতার গ্লানিটুকু আকণ্ঠ পান করে উগরে দিলে স্থির স্বাধীনতা
যার তর্জনীকে জাগলো এ দেশ, যার কথা হানলো আঘাত শত্রুর বুক; দীর্ণতার
চিহ্ন নিয়ে সজ্ঞানু শক্তির পদে পদে হাঁটলো পরাজয়। তাঁকে ভুলেটবিদ্ধ করতে
হাত কাঁপেনি ঘৃণ্য শক্তির। কিন্তু সেই অপশক্তির ঠাঁই সর্বদা আস্তাকুঁড়ে

বারবার ধ্বনিত হয় সেই কণ্ঠস্বর। ধ্বনিত হয় জাতির পিতার নাম; বাঙালি সত্তায়
তিনি অবিলীন, অবিলীন দেশে দেশে। জাতিসংঘের জিয়ন্ত দরবারে

অথচ চাওয়া হয়েছে রক্তে রঞ্জিত পতাকার সামনে খুনির স্বীকৃতি, অথবা দেয়া হয়েছে
খুনের জয়ধ্বনি। আমার দেশ কি অন্ধ মুহেনি। সোনা জলের স্বাদ জিহ্বাই নিয়ে
করেনি কি পার দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর। আমি চেয়ে থাকি-
পদ্মা মেঘনা যমুনা ধলেশ্বরী গড়াই আড়িয়াল খা মহানন্দা নাকের দিকে; তারা কি লিখে
তারা তো লিখেছে বিজয়ের গান রক্তস্রোতে। লিখেছে বীরের নাম প্রতিটি চৌত্রের পিঠে-পিঠে
আর জনকের নাম সারা অঙ্গে মাখিয়ে দিয়ে গেছে ভিসুভিয়াসের মুখে; সায়াহ্নার জলকণা ছুঁয়ে
ইংলিশ চ্যানেল অভ্যন্তরে খুলে মুজরের ঠোঁটে আর হিমালয় বুকে

এই তো রাত এই তো দিন, সময়ের চুল ব্যবধানে আমি আর ব্যর্থতার ঋণ; বিশাল সুইচ
সরে আসি নিজের পাশ থেকে। কখনো কি আসবে না, চেতনার শ্বাস!
এখনো অনেক সময় বাকি; চুপ করে থাকি। এ মন্ত্র আমার নয়। ঘুমোবার দিন শেষ
ডাক দিয়ে যায় জনকের স্বর, আমরা বাঙালি-আমরা বীর। আমরা নয় ভীরু-কাপুরুষ
দেশের জন্য শঙ্খ মোকাবিলায় থাকি জেগে। আপনে রাখি স্বাধীন জনপদ, -এই আমার পতাকা
এখনো তাকিয়ে আছে জনক

একটি কণ্ঠস্বর ভাবে বলে কান পেতে আছে সবুজ প্রান্তর। দিগন্তের মেঘবিষ, কুয়াশার বদন
নীড়ের নীচে ঝুলে থাকা পাতায় যত শিশির স্নেহ, কল্পনার রঙ। বাবার আঙুল
মায়ের হাত আর বোনের আদর। ভাইয়ের বদন ঘুরে ঘুরে ওড়ে আমাদের ভালোবাসা
একদিন ভাবে বাঙা তারা কাছে এলো। কান পাতো বাতাসে
-ঐ তো শোনা যায় 'আমার বুকের ওপর আর গুলি চালাবার চেষ্টা কর না '
ঐ তো ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে আসে 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো'
এ কি ভালোবাসার জন্য যথেষ্ট নয়! বলো, আর কি চাই!
ওই স্বর, ভালোবাসতে শেখায়

হলো রক্ত বিনিময়, তবু ভালোবাসা অবিনশ্বর। আত্মবতে সংঘাতে, ভালোবেসে
হত্যা করলে জাতবের পাশ: রক্ত। রক্ত আর রক্ত পড়িয়ে গেল প্রেমিকের বুক।
বাংলাকে ধারণ করা চোখ থেকে খুলে গেল কালো মোটা ফ্রেমের চশমা।
যা আজও তাকিয়ে রয়েছে অবিরাম বাংলার দিকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙা
কণ্ঠস্বর নিয়ে। আমরা থাকতে; চাইলেই কি আর মুছে ফেলা যায় তাঁকে!
অন্তরে লেখা যায় নাম। ভালোবাসি যাকে ।

গণমাধ্যমে বাংলা ভাষা

ড. সৌমিত্র শেখর

একটা জিজ্ঞাসা দিয়ে সূচনা করা যাক; যদি বিশ্বসভায় বলা হয়, পৃথিবীর সমুদয় ভাষার মধ্যে প্রথম একশটি ভাষার এক মিনিট করে নমুনা উল্লেখ বা পাঁচ বাক্যের উদ্ধৃতি দেয়া হোক। সে ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে বাংলা বলবো বা লিখবো? আমাদের তো নানা আঞ্চলিক ভাষা আছে, সাধু ভাষাতেও লিখছেন কেউ কেউ, আছে চলিত ভাষারীতি। তখন নিশ্চয়ই এ বিচিত্রতার মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় একটা কিছু খুঁজতে হবে আমাদের। একে আপনি 'প্রমিত ভাষা' বলতে পারেন, আবার নাও পারেন। 'মানরীতি' বলতে পারেন, না বললেও ক্ষতি নেই। বলতে পারেন 'সর্বসাধারণ্যে উপস্থাপনার রীতি', বলুন। আবার কিছুই না বলতে পারেন। তাই বলে আপনি কোনো এলাকার ভাষাকে অথবা স্থানীয় ভাষার সঙ্গে বিদেশি বিকৃত উচ্চারণ সমন্বিত 'ককটেল' ভাষাকে বাংলা ভাষার নমুনা হিসেবে বিশ্বসভায় উপস্থাপন করবেন না। কারণ আপনি জানেন, কেউ বা মুষ্টিমেয় লোক এ জাতীয় ভাষারূপ ব্যবহার করলেও সেটা যথার্থ বাংলা নয়, বাংলা ভাষার প্রতিনিধি স্থানীয় রীতি তো নয়ই।

আমরা কিছুটা শঙ্কিত গণমাধ্যমের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিসাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে। ভিতরে অপঘাত এখানে আরম্ভ হয়েছে। এই গণমাধ্যমের কিছু ক্ষেত্রে বাংলার নামে এক জাতীয় বিকট ভাষার চর্চা চলছে। একটি ছোট্টগোষ্ঠী ছাড়া অধিকাংশ মানুষের ভালোলাগা-মন্দলাগার জায়গাটি স্পর্শ করতে পারে না এই ভাষারূপ। কারণ এ ভাষারূপ বাংলার মানভাষা তো নয়ই, আঞ্চলিক ভাষাও নয়। একালে গণমাধ্যমে যে আটপৌরে বা বিকট ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, ব্যবহারকারীদের অনেকেই অবশ্য একে 'আঞ্চলিক ভাষা' বলতে চান। রাজধানী-ঢাকা বা শহর-ঢাকার ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলার কোনো কারণ নেই। ঢাকার এখন দুটো ভাষা। একটি ঢাকাইয়াদের, ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা এবং আর একটি নগর-ঢাকার সংমিশ্রিত (দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার সমন্বয়ে) ভাষা। ঢাকাইয়া ভাষা এই সংমিশ্রিত ভাষার নিচে প্রায় চাপা অবস্থায় রয়েছে। যে কোনো শহর বা নগরেই একটি সংমিশ্রিত ভাষারীতি গড়ে ওঠে, ঢাকার ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। ঢাকার এই নাগরিক সংমিশ্রিত ভাষারীতির একটি স্তরে উচ্চবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তদের নন্দন-নন্দিনীরা এই 'বিকট ভাষারীতি'র জন্ম দিয়েছে। 'বিকট ভাষা' কিন্তু ঢাকায় যারা বাস করেন, সেই সর্বসাধারণের ভাষা নয়। এই ভাষারীতি আজ একটি প্রজন্মের মুখে তুলে দেওয়া হয়েছে; কোথাও উঠি উঠি করছে। উনিশ শতকে কলকাতা শহরে যে 'বাবু-কালচার' তৈরি হয়েছিল এবং এর যে ভাষারূপ গড়ে ওঠে, এটাকে তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। কারণ, প্রতিষ্ঠা অনেক আগে হলেও এখনই ঢাকা প্রকৃত নগরের বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে। তাই এর ভাষাতেও আবর্জনা ও যথেচ্ছাচারের প্রমাণ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বাবু-কালচারের 'বাবু-ভাষা'র শিকড় বেশি দূর যেতে পারেনি; তখনকার সাহিত্যবোদ্ধা ও সংস্কৃতিভাবুকগণ সচেতন ছিলেন বলে। এখন 'বিকট ভাষা'র প্রকট প্রভাবের একটি কারণ বোধ হয় এই, বর্তমানে সাহিত্যবোদ্ধা ও সংস্কৃতিভাবুকগণের নির্লিপ্ততা। এঁদের কেউ কেউ তথাকথিত সংগঠনকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেই কর্তব্য শেষ বলে বিবেচনা করছেন। তাও সেটা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক। আমরা আঞ্চলিক ভাষার বিরোধী নই। এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাসমূহ বাংলা ভাষার দেহের শিরা-উপশিরার মতো প্রবাহিত। এ

ভাষার সাহিত্য, ছায়াছবি, নাটক এমন কি বিজ্ঞাপনও হতে পারে, হয়েছেও। তাছাড়া পরিমিতবোধ জাগ্রত রেখে কোনো শিল্পী যদি সীমিতভাবে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করে সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য আনতে পারেন, সেটা তো সর্বমহলেই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে আঞ্চলিক ভাষা ও 'বিকট ভাষা' এক নয়। আঞ্চলিক ভাষার পুরুষ পরম্পরায় মানুষ কথা বলছে, পিতামহ-পিতা থেকে সন্তান পর্যন্ত। অর্থাৎ কয়েক প্রজন্মের ভাষা এটি। আর 'বিকট ভাষা' এক প্রজন্মের ভাষা, কৃত্রিম। পিতামহ-মাতাপিতার ভাষার সঙ্গে সন্তানের ভাষার মিল নেই। তাই ঢাকায় বর্তমানে প্রচলিত 'বিকট ভাষা'কে আঞ্চলিক ভাষা বলা যাবে না।

স্বীকার করতেই হবে, আমাদের গণমাধ্যমও ভাষারীতির প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ দেশের অনেক মানুষ আছেন যারা মনে করেন পত্রিকা বা রেডিও-টেলিভিশন থেকে তারা শুধু সংবাদ বা বিনোদনই লাভ করবেন না, ভাষাটাও শিখবেন। তারা মনে না করলেও আসলে গণমাধ্যমের ভাষাটা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমি তো আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে জানি, যাদের কোনো কোনো বাংলা বানান নিয়ে আমি আপত্তি জানালে ওরা কিছু পত্রিকার দোহাই দেয়। উচ্চারণ প্রসঙ্গে বললে বাণিজ্যিক রেডিও-র কথা বলে। ফলে শিক্ষিতরাই যখন গণমাধ্যমের এই তাত্ত্বিক প্রভাবের বাইরে নয়, সেখানে সাধারণ মানুষ এই প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে কীভাবে? আমার তো মনে হয়, এই প্রভাব গণমানুষের উপর শুধুই 'প্রভাব' হিসেবে আর থাকছে না, 'আধিপত্যে'র রূপ নিচ্ছে নিজস্বের শক্তি নিয়ে।

যদি বলি বাংলাদেশের গণমাধ্যম কাগজেকলমে স্বাধীন; ভাষা-ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী- খুব বাড়িয়ে বলা হলো? বলছি আরো, এই স্বেচ্ছাচারকেও তারা স্বাধীনতা হিসেবে মনে করে। শুধু মনে করে না, প্রচারও করে। এটা গর্ব নয়, উন্মাদনা। এই কথাগুলো কিছু কিছু সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তো সর্বাংশে সত্য। যে ভাষার জন্য এতো সংগ্রাম, এতো আত্মত্যাগ, এতোটা অহংকার যে ভাষার জন্য, সে ভাষার রূপটি দেখুন। একটি রেডিও স্টেশন থেকে বলা হচ্ছে: 'শুরু হলো একটি নতুন দিন, আর এরই সঙ্গে তোমাদের বাসের Happy birthday তাদের wish করে নিচ্ছি আমরা। [...] sms send করে জানিয়েছো তোমাকে wish করার মতো কেউ নেই। so what, আমরা তো আছি। Very very very happy birthday to you. একদম disheartened হবে না, we hope, next year-এ তোমাকে wish করার মতো কেউ অবশ্যই জুটে যাবে।'

এ রকম উদাহরণ বিভিন্ন রেডিও স্টেশন, ছায়াছবি, টেলিভিশন-নাটক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি থেকে প্রচুর দেওয়া যেতে পারে। যারা এ-ভাষায় সংবাদ লেখাচ্ছেন, নাটক- সিনেমা লিখে অভিনয় করাচ্ছেন, বিজ্ঞাপন তৈরি করছেন, তাদের জিজ্ঞেস করুন, কেন তারা এসব করছেন? তারা বলবেন, এসবই এখন যুগের ভাষা। আপনি বলুন, আড্ডা-আলাপের ভাষা আর দেশ ও বহির্বিশ্বের বৃহত্তর পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের উদ্দেশে বলার ভাষারীতি এক হওয়া উচিত নয়; লেখার রীতি তো নয়-ই (বঙ্কিমচন্দ্র: 'কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথন ও লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্যজ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তরঞ্জন।' —এ জাতীয় মনীষী-বক্তব্য আপনি তাকে না-ই শোনালেন) এর পর আপনাকে তারা হয়তো বলবে, ভাষা-প্রকাশের স্বাধীনতা তাদের আছে। ফলে তারা যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষাতেই পত্রিকায় লিখবে, নাটক-সিনেমা বানাবে, রেডিও চালাবে। তাদের এই স্বাধীনতা ও অধিকারের আস্ফালন শুনে সত্যি আপনার আর কিছুই বলার থাকবে না। শুধু বলতে পারেন: 'হ্যাঁ, বিষয় হওয়ার স্বাধীনতাও আপনার আছে। উন্মাদদের পরিবেশজ্ঞান থাকে না।' ভেবে দেখুন, যে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, সেখানে বাংলা ভাষার ইচ্ছে মতো বিদেশি, বিশেষ করে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছেন; বলছেন 'থার্ড ডে', 'সেন্স', 'সেন্ড করা'; 'ডিসহার্টেড'। সংবাদপত্রের সাহিত্য সাময়িকীতেও এ জাতীয় লেখা হচ্ছে। আমার সম্পাদিত একটি গ্রন্থের আলোচনা লিখেছেন সাধাওয়াত টিপু। সেখান থেকে সামান্য উল্লেখ করি, 'কবাগোটিক সুধীন্দ্রনাথকে নিয়া সৌমিত্র শেখরের কেন এ আলোচনা? তিনি কি ঢাকার বাজারে সুধীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে আলোচনার চান নাকি নিছক উপলক্ষের লক্ষ্য নেয়া? [...] সম্পাদকের বয়ানে বোঝা যায়, নিছক উপলক্ষ নিয়া তিনি সংকলনখানা করেন নাই। এর অন্য মাত্রেজ-ও আছে। মাত্রেজা কী? কবি বাল্যজীবনে শিক্ষা নেন সংস্কৃত ভাষায়। তাঁর পরিবারে চলত হিন্দি ভাষা। আর বিদ্যালয়ে বেড়েছেন ইংরেজি ভাষার কলরে। তবে বাংলা তাঁকে সন্তুলভাবে রপ্ত করিতে হয়। [...] সাহিত্যে নির্বিবাদের আয়োজন নাই। বাংলার আলোর সাহিত্যের উদ্ভাসিত হয় ঠিক তেমনে অন্ধকারের ছায়া মুইছা ফেলা সম্ভব না।'

একটি সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত আলোচনার এই ভাষাকে আপনি কী বলবেন? এটা কি বাংলাদেশের কোনো আঞ্চলিক ভাষা? তাতো নয়। এটা ঢাকা বা চট্টগ্রাম নগরের মিশ্রিত ভাষাও নয়। আরবি-পারসি শব্দের সঙ্গে সাধু-চলিত-আঞ্চলিক শব্দ ও রীতির যথেচ্ছ মিশ্রণে এ এক অদ্ভুত ভাষা। এই ভাষায় কেউ যদি কথা বলে, বলুক। কিন্তু এ রকম ভাষা ব্যবহার করে একটি পত্রিকার গ্রন্থালোচনা লেখা কি শোভন?

১৮০১ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম কেরির কথোপকথন থেকে খানিকটা উল্লেখ করা যাক :

'তুই আমার কি কাযে ঠেকিয়া এত কথা কইস লো।

চক্ষুখাকী তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না এ সকল কায কে করিয়াছে।

তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে এক দিন কায করিয়া এত কইস। আমি তোর সকল জানি।

পুতখাকী তুই আমার কি জানিস। তোর মত পাজী মরদের কাছে আমি যাই না।

গঙ্গানী। তুই যেমন উহাকে ভাই বলিস রাত্রে তাহারে লইয়া থাকিস। সেমত আমরা নই।

আরে পেট ফেলানি খানকি। আমি কারে লইয়া থাকি। তুই কারে দেখিয়াছিস রে।

তোর যে বড় গলারে ভাইখাকী। আজি তোর অহংকার ভাঙিতে হবেক। তাহা নহিলে তুই নিরস্ত হবি না।'

(মাইয়া কন্দল 1 কথোপকথন)

কথোপকথনের এই ভাষারীতি গণমাধ্যমে বা তৎকালীন সাহিত্যে গৃহীত হয়নি। তখন চলতিও ছিল না। থাকলে সেখানেও এই ভাষা সমাদৃত হতো না। তাহলে আজ সরদার ফারুকী বা তাঁর অনুসারীরা নতুন কিছু কি দিয়েছেন? দেননি। পুরোনো ও পরিত্যক্ত মডেলই উপস্থাপন করেছেন মাত্র। তবু তো বলা যায়, কথোপকথন-এর ভাষা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর। অনেকে বলে থাকেন: 'শিশুকিশোরেরা জগাখিচুড়ি

ভাষা শিখে ফেলবে এই ভয়ে আমি আমার চলচ্চিত্রে চরিত্রের ভাষা বদলে দেব?' আমরা বদলে দিতে বলছি না, বলেছি যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে। আপনি নিজে যদি জেনেই থাকেন যে এটা 'জগাখিচুড়ি ভাষা' তা হলে এ নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি কেন? দীনবন্ধু মিত্র সধবার একাদশী (১৮৬৬) নাটকে নিমচাঁদ দত্ত নামে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক বাঙালি যুবকের চরিত্র তৈরি করলেন, যার ভাষায় বাংলা-ইংরেজি মেশানো সংলাপ; মদ্য পান, মাগীসঙ্গ ইত্যাদিতে অনেকটা ইউরোপীয় আচরণ; চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ; চরিত্রসৃজনের সঙ্গে তাঁর সংলাপের উচ্চারণ ও অভিনয় গুণে নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। আজো নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় নিমচাঁদ অসাধারণ চরিত্র। কিন্তু দীনবন্ধু পরবর্তীকালে নিমচাঁদের ভাষায় আর কোনো নাটক লিখলেন না; চরিত্র বানালেন না- যদিও এরপর দীনবন্ধু মিত্র আরো ছয়টি বই লিখেছেন। কারণ, শিল্পীর সংযম। তিনি জানতেন, নিমচাঁদরা সমাজে আছে সত্য, কিন্তু সবাই নিমচাঁদ নয়, নিমচাঁদদের ভাষাও বাঙালিসমাজের সাধারণ ভাষা নয়। সিনেমার যুগ হলে সধবার একাদশী পর্দায়ও আসতে পারত। এর আগে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষারীতি, কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোমী বাংলাও সংবাদপত্র বা সাহিত্যে সমাদর পায়নি। তার কারণ সেখানে রচয়িতাদের পরিমিতিবোধের খামতি ছিল। আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য যেহেতু পত্রিকা মুদ্রণ বা সাহিত্য রচনা হয়ে থাকে সেহেতু মোটামুটি সর্বজনবোধ্য একটি রীতির সন্ধানই শ্রেয়। আমরা 'সর্বজনবোধ্য' বলিনি; বলেছি 'মোটামুটি সর্বজনবোধ্য'। কারণ আমরা জানি, সব বাঙালিকে বোধের এক সীমানায় বাঁধা যাবে না। এই মোটামুটি সর্বজনবোধ্যতার রীতিই 'মানরীতি' বা 'প্রমিত ভাষা'।

যারা বলবেন এবং মানবেন যে চলচ্চিত্র বা টিভি-নাটক একটি শিল্পমাধ্যম, তাদের সঙ্গে যে কথা হবে, যারা ভাববেন নাটক-সিনেমা মূলত অর্থ 'কামাই'-এর উপায়, তাদের সঙ্গে সে কথা স্বাভাবিকভাবেই হবে না। চলচ্চিত্রের পেছনে বা নাটক তৈরিতে পুঁজি খাটাতে হয় সত্যি, কিন্তু যথেচ্ছভাবে সুদে-আসলে বিনিয়োগ তুলে আনাই নাটক বা চলচ্চিত্রের মূলকথা নয়। যদি বিনিয়োগ ও মুনাফাই এর মূলে থাকে, তবে শিল্পমাধ্যম না বলে একে বাণিজ্যমাধ্যম বলা শ্রেয়। ইদানীং অনেকেই টিভি-নাটক বা চলচ্চিত্রকে বাণিজ্যমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যে কোনো শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 'অধিকার' যেমন আছে, তেমনি তাঁর 'দায়িত্বও' আছে। চলচ্চিত্রকে শিল্পজ্ঞান করলে এর সংশ্লিষ্ট সবারই ন্যূনতম 'কমিটমেন্ট' থাকতে হয়। এ কমিটমেন্ট দেশ, জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষার স্বার্থে। আর একে বাণিজ্যজ্ঞান করলে 'দায়িত্ব' বা 'কমিটমেন্ট' বলে পিছুটানের বালাই থাকে না। বরং বৈশ্যগণ এ ধরনের শব্দকে ভয়ই পায়। লক্ষ করুন, এ ধরনের নাটক বা চলচ্চিত্র নিয়ে তারা দর্শকের সামনে আসার আগেই 'স্পন্সর'-এর কাছে ধর্ণা দিয়ে তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের সিংহভাগ বা পুরোটাই সুদে-আসলে ফেরত পাচ্ছেন, অর্থাৎ তাদের পণ্য বিক্রি করে দিচ্ছেন। আর বিক্রিই যেখানে মূল্য উদ্দেশ্য, সেখানে ক্রেতাতুষ্টিই প্রধান, শিল্পের চেতনা বা বোধ নয়। রূপবান, বেদের মেয়ে জোছনা, খায়রুল সুন্দরী ইত্যাদি ছায়াছবির প্রযোজক-পরিচালক অর্থাৎ নির্মাতারা কিন্তু স্পন্সর পাননি; হয়তো খোঁজেননি। নিজেরা পুঁজি খাটিয়ে, তাদের বিচারে শিল্পমান অক্ষুণ্ন রেখে তারপর তারা ব্যবসার কথা ভেবেছেন। সারা দেশের মানুষ একটি একটি করে টিকেট কিনে এই ছায়াছবিগুলোর প্রতি তাদের সমর্থন ও ভালোবাসা দেখিয়েছে। এই ছবিগুলোর ভাষাতো প্রশ্নবিদ্ধ নয়। ময়নামতি, গোলাপী এখন ট্রেনে ইত্যাদি ছায়াছবির মতো মানুষের হৃদয় জয় করে ব্যবসা করার সাহস কি এই 'নব্য দার্শনিক' নির্মাতারা রাখেন? রাখেন না। যেমনটি বললাম, তারা ছায়াছবি বা নাটক নির্মাণের আগেই স্পন্সরের কাছে লেজলো বিক্রি করার জন্য ধর্ণা দেন, প্রয়োজনে ক্রেতার মনস্তুষ্টি করে নাটক বা চলচ্চিত্রের মূল পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তনও আনেন, ক্রেতার ইচ্ছায় তাদের বৌ-বাচ্চাকে অভিনয় পর্যন্ত করান। এভাবে সব দিক থেকে তারা যখন বিক্রিত হয়ে যান, তখন ভাষার বিকৃতি তাদের কাছে অতি তুচ্ছই মনে হয়।

গণমাধ্যমের আর একটি প্রসঙ্গ বিজ্ঞাপন। এ নিয়ে বহু লেখা যায়। আমরা একটি কথাই বলবো- বিজ্ঞাপনে পণ্যের কথা থাকে বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন 'নিজেও' একটা পণ্য। যারা বিজ্ঞাপন বানায় তাদের কাছে এর বিক্রিটাই মুখ্য। আগে বিজ্ঞাপনী সংস্থার রুচিশীল নির্মাতারা এখানেও 'দায়' বোধ করতেন। এখন পত্রিকায় ওঠা 'এন্ড ফার্মে'র মালিকেরা তাদের বিজ্ঞাপনপণ্য বিক্রির কথাই আগে ভাবেন- দায়-দায়িত্বের বালাই তাদের কাছে নেই। তাই সেখানে 'আবার জিগার', 'ঝাকুকা' ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। গণমাধ্যমের কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এভাবেই বিকৃতি ও বিকৃতির কবলে পড়েছে।

অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই, ভাষা স্থাণু নয়, গতিশীল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দর করে বলেছেন: 'এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বলতেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনো লিখতেম এবং যারা করেই বসে থাকতেম সবাই।' সত্যি বাংলা ভাষা যারা করে বসে নেই, চলছে। তবে এই চলাটা বা পরিবর্তনটুকু সিজরেরে হয়নি, হয়েছে নিয়ন্ত্রিত গতিশীলতা আত্মীকরণের মাধ্যমে। যদি সিজরেরেই হতো, তাহলে নিশ্চিত, আমাদের ভাষা-শকট যেতো উল্টে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'আমাদের ভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে এই নিয়ন্ত্রিত গতিশীল ভাষারূপকেই বলেছেন 'মধ্যমপন্থা' আর এ ধরনের সিজরেরেরী পরিবর্তনের বিপক্ষে মত দিয়েছেন: 'মধ্যমপন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগ (Transitional period)-এর উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।' আমরা মনে করি, জীবন্ত ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মুখের নানা শব্দ বা শব্দবন্ধ সম্পৃক্ত হবে। প্রত্যেক ভাষারই প্রমিত, আঞ্চলিক, চলতি- এই তিন রূপ থাকে। বাংলা ভাষারও আছে, থাকবে। চলতি রূপ সময়ের নিখুঁতক্রিয়ায় গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। ভাষার এই সমন্বিত সুডৌল রূপটিই গণমাধ্যমে আদরণীয় ও অনুসরণীয় হওয়া উচিত। কিন্তু সম্প্রতি কিছু গণমাধ্যমে বাংলা ভাষার উপর জবরদস্তি করে সেই রূপময়তা বিধ্বংসের আয়োজন চলছে, এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

লেখক: উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

মায়ের বোলে

কামাল বারি

সীমাহীন সুন্দর এক মায়ের কোলে জেগে উঠি আমি-
সীমাহীন সুন্দর এক মায়ের বোলে কথা বলি আমি-
এই আমি মায়ের সুরে মায়ের গানে জাগ্রত বাঙালি;
হৃদয়ে আমার 'মানুষ মানুষের' মানবিক বন্ধন;
মায়ের সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আমি টের পাই- স্বপ্নআঁকা;
আমি টের পাই বীর বাঙালির দুলাহুসী বেড়ে ওঠা;

আমার কণ্ঠে মায়ের অমৃত কথার অপার সম্ভার;
আহা, সীমাহীন সুন্দর সবুজভূমি আমার বাংলা মা।

বিধ্বস্ত জমিনে স্বপ্নবুনি

রফিকুল ইসলাম

কাঁপছে অনুখনু উষ্ণ-ওম খোঁজে হিম পৌষে
শীত আর রোদ খেলা করে কুয়াশার উঠোনে
রৌদ্রের স্রোত নিয়ে যায় বিভাজনের উজানে।
স্থিরজলে ডুবে যায় রাতের সফেদ চাঁদ আর
রূপালি জোছনার ওষ্ঠের মৃদু হাসি
দুঃখবোধে দিগন্ত ছুঁয়ে যায় অনুভূতির অনুদিত
কষ্টের অনুবাদ পাণ্ডুলিপি।
ইচ্ছার কাছে ছিঁড়ে ফেলে স্বপ্নপিঞ্জের খুকখুক
বেজে উঠে কর্কশ ধাতব প্রতিধ্বনি,
পরিস্রুত জলের স্রোতে ঢেলে দেয় আগুনে সুখ।
পৃথিবী ভেঙে পড়ে সুখময় সুখশয্যার রাতে
ভূপৃষ্ঠের বিধ্বস্ত বুকে খুঁজি নীতিবিদ্যার অবশেষ
অনিশ্চিত মহাকালের কিনারে আশার স্বপ্ন বুনি
সুরক্ষিত ভ্রূণে অনাগত শিশুর সবুজ বসন্তদেশ।

ফাগুন

মনিজা খানম

ফাগুন আসে
নতুনের সমারোহে
পুরাতন পাতা ঝরে,
ফাগুন আসে
নব পল্লবে
প্রকৃতির প্রাণ ভরে।
ফাগুন আসে
কোকিলের আগমনে
কুহু কুহু তানে,
ফাগুন আসে
মধু ফুল বনে
ভ্রমরের গুঞ্জনে।
ফাগুন আসে
হলুদিয়া পাখির
মিষ্টি বরণে,
উদাস হাওয়ায়
লাজুক শিহরণে।
ফাগুন আসে
আগুন ঝরা
দিনের ছবি দেখে,
মায়ের ভাষায়
কথা বলার
দাবির গল্প থেকে।
তাইতো ফাগুন
তোমার জন্য
কবিতায় ছবি আঁকা,
গল্প, কথায়
বাংলা মায়ের
ফাগুন বিভোর থাকা।

ভালোবাসার পাখি

মোখলেছা খাতুন

‘একটা বয়স আসে যখন ছেলে-মেয়েরা লুকিয়ে প্রেম প্রেম খেলা করে। কারোটা স্থায়ী হয়- কারোটা সমাজ-সংসার ধনী গরীব ভেদাভেদের যাতাকলে পড়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কখনও এর পরিণতি ভয়াবহ হয়। জীবন দিয়ে সমাজকে বোঝায়- ভালোবাসা অপরাধ নয়। আবার মেয়েটি অন্য কারো ঘরনি। ছেলেটি কিছুদিন ভবঘুরের মতো ঘুরে নুতন কাউকে জুটিয়ে নেয়। মেয়েটি কেঁদে বুক ভাসায়। একসময় সবই স্মৃতির মোড়কে বাঁধা হয়। বিষকাঁটার মতো কখনও হৃদয়টাকে ক্ষত-বিক্ষত করে।’

সারাদিনের পরিশ্রমে ঘামে ভেজা বোতামছেঁড়া জামাটা গায়ের সাথে লেপটে গেছে। হাসান সার্টটা খুলে ঘরে টানানো দড়িতে মেলে দেয়। নড়বড়ে চৌকিটায় বসে কোমর থেকে গামছাটা খুলে ঘামটা খামুছে নেয়। ভাঁজ-খাওয়া চামড়ার স্যান্ডেল খুলে পা দুটো লম্বা করে টান টান করে। সারাদিনে পা দুটোর যা ধকল যায়। সূর্য-ওঠা ভোর থেকে রাত দশটা-এগারটা। রিক্সার প্যাডেল ঘুরিয়ে ঢাকা শহর চষে বেড়ায়। পা দুটোর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। হাতের অবস্থাও অদ্রূপ। রিক্সার হ্যান্ডেল ধরে ডান বাঁও করতে করতে তালু শক্ত হয়ে কালচে দাগ পড়ে গেছে। যে হাতে বই খাতা থাকার কথা... হাসান আর ভাবতে পারে না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আশারগাঁও, মিরপুর, ফার্মগেট, মোহাম্মদপুর- খ্যাপ নিয়ে যাওয়া পড়ে। ফাগুন মাসের কড়কড়ে রোদ মাথায় লেগে মাথাটা ঝিমঝিম্ করছে। তবুও ফাল্গুন মাসে ভাড়া ভালোই আয় হয়। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ চিড়িয়াখানা, বলধাগার্ডেন, শহিদ মিনার ঘুরতে যায়। বদিও ঢাকায় এখন বড় বড় বিল্ডিংয়ে সবুজ খুব একটা দেখা যায় না। হাসান সারাদিনে একটুও জিরোয় না। খুব খিদে পেলে ফুটপাথের দোকান থেকে একটা বনরুটি এক গ্লাস পানি খেয়ে নেয়। ভাবে টাকা জমাতে হলে কষ্ট করতে হবে। বস্তির ঝুপড়িঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। অধিকাংশ ঘরের বাতি নেভানো। রাস্তার লাইটপোস্ট থেকে হালকা একটু আলো ঘরের চালে পড়লে ঘরে পৌঁছায় না। দেশলাই দিয়ে কেরোসিনের কুপিটা জ্বালায়। পাশের ঘরে

হারিস ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে,

- ভাই অহন ফিরলা? এত খাটুনি কইরো না। আমার তো ঘুম হইয়া গেল।

- হু। হাসান সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

- আইজ কেমুন কামাই হইল?

- ভালো।

- আসলে এইডাই হইল আসল ভালোবাসা। সিনেমার মারকপো লাহান। খাইছো কিছু?

- না।

- হোন অহন আর চুলা জ্বালাইও না। আলুসেদ্ধ দিয়া ভাত রান্ধিলাম। সব খাইতে পারি নাই। বারান্দায় ঝাপি দিয়া চাপা আছে। পানি দিয়া ধুইছি। খাইয়া লও।

- থ্যাংক ইউ হারিস ভাই।

- আরে এতে আবার ইংরেজি কওন লাগে? বুঝি, তোমারে যেদিন পয়লাম দেখছি- হেইদিনই বুঝি তুমি ভালা ঘরের পোলা। এইহানে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই। অহন আমরা এক মানুষ। হারিস হাই তুলে। খাইয়া লও। ঘরে নীচু হয়ে ঢুকতে বেরুতে হয়। চৌকির একপাশে কিছু কাঁথা-বালিশ। দড়ির উপর কিছু কাপড়-চোপড়। কাপড় বলতে দুটো সার্ট-লুঙ্গি-একটা প্যান্ট। ইট দিয়ে খাট উঁচু করা। খাটের নীচে একটা টিনের বাক্স। এই তার সম্বল। ভাগ্যক্রমে হারিসের সাথে দেখা হয়েছিল। একটা রিক্সার গ্যারেজের মালিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম ক'দিন রিক্সা চালাতে গিয়ে হাত-পা কেটেছে। তবুও মনে মনে হারিসকে ধন্যবাদ জানায়। হারিসের বাহ্যিক চেহারায় বোঝা যায় না তার ভিতরে একটা ভালো মন আছে। চোয়াল জাঁদা, উসকো-খুসকো চুল। গায়ে পোঁচকা গন্ধ। মনে হয় গাজা খায়। কি কাজ করে হাসান জানে না। জানার ইচ্ছাও নেই। আশ্রয় পেয়েছে এটাই যথেষ্ট। প্রথম ক'দিন একসাথে ঘুমোতে হাসানের দম বন্ধ হয়ে আসত। কাজ পাওয়ার পর আলাদা ঘর নিয়েছে। হাসান প্রথম দিনের রোজগার থেকে হারিসের কাছের ঋণ কিছুটা পরিশোধ করতে গিয়ে বরং লজ্জা পেয়েছে ও অবাক হয়েছে। হাসান এক বিশাল সমুদ্রের সন্ধান পেয়েছে। যা ধন-সম্পদের মালিক হয়েও এমন হৃদয়বান হতে পারেনি অনেকে। হারিস নামের এই মাতাল লোকটি তার হৃদয়ে চিরকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে।

হাসান হাজারো ক্লান্তি নিয়ে রোজকার মত খাটের নীচ থেকে টিনের সুটকেসটা বের করে। কোমরে ভাঁজের সাথে চাবি দিয়ে খোলে। খোদাই করা ছোট একটা কাঠের বাক্স। মায়ের গহনার বাক্স। একটা সোনার চেইন এক জোড়া কানের দুল হাসানের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলো, তোর বাবার স্মৃতি- প্রয়োজনে কাজে লাগাস। মা বাকিটুকু বলতে পারেনি- চোখের পানিতে ভরে গিয়েছিল। হাসান প্রথম দু'দিন বাড়ি থেকে আনা একটু চিড়া আর পানি খেয়েছিল। হাসানেরও চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কাপড়ের আরো একটা থলি বের করে। হাতে ধরে অনুমান করে বেশ ভারি হয়েছে। লুঙ্গির গাঁইট থেকে আজকের রোজগারের টাকাগুলো বের করে দশ টাকা, দুই টাকা, বিশ টাকার নোটগুলো আলাদা করে সাজায়। হিসেব করে দেখে মোট তিনশত চৌত্রিশ টাকা- একটা বনরুটি এক কাপ চা খেয়েছে শুধু। মহাজনের টাকা, ঘরভাড়া, খাওয়া বাদ দিয়ে এই এক বছরে প্রায় বারো হাজার টাকা জমেছে। হাজার বিশেক হলে দেশে গিয়ে একটা দোকান দিবে। তখন তাকে কেউ বেকার বলবে না। ভেজা সার্টের পকেটে পলিথিনে পেচানো একটা ছবি বের করে। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ দেখে। নাক, ঠোঁট কপাল ঘুরে চোখে চোখ রাখে। তার ভালোবাসার মানুষ। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি। হাসান ছবিটার সাথে মৃদু স্বরে বলে- - তুমি কি জানো মম তোমার হাসান ঢাকার শহরে রিক্সা চালায় আরো কিছু টাকা জমিয়ে আসবে। তখন চাচা না করতে পারবে না। বড় করে ঘরে আনব। লালপেড়ে শাড়ি লালটিপে মমকে অপূর্ব লাগে। ঢাকায় আসার সময় মোমেনা গোপনে এই ছবিটা আর হাতে সেলাই করা একটা বালিশের কভার দিয়ে বলেছিল- বালিশে শুয়ে আমার কথা মনে করবে। আমাকে কাছে না পেলেও ছবিটার আদর করে দিও, আমি অনুভব করে নেব। হাসানের চোখটা ভিজে ওঠে। আলতো করে ছবিটায় হাত বুলায়- ছবিটার কপালে আলগোছে ঠোঁট ছোঁয়ায়। কতদিন হলো তোমাকে দেখি না। একটা দীর্ঘশ্বাস নেয়। পলিথিনের ভাঁজে আবার ছবিটা যত্ন করে রেখে দেয়। সুটকেসটা খাটের নীচে ঢোকায়। হাত-মুখ ধোয়। সারাদিনের রোদে পোড়া চোখগুলো একটু ঠাণ্ডা হয়। হারিসের রাখা পানি দেয়া ভাত, আলু ভর্তা তৃপ্তি করে খায়। খিদের সময় অমৃতের মতো মনে হয়। খেয়েই সটান ঘুম। সকালে হারিসের ডাকাডাকিতে হাসানের ঘুম ভাঙে। সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিল।

- কি হইল ভাই, সাতটা বাজে কামে যাইবা না?

- হ্যা হ্যা, চোখে মুখে পানি দেয়। তাড়াতাড়ি সার্ট পরে- ইস্ এত বেলা হয়ে গেছে।

হারিস যেতে যেতে বলে কইছি না- এত রাইত জাইগা কাম করবা না আগে শরীর, তুমি আও- আমি যাই।

- হাসান পেছন থেকে বলে- এই তো। হারিস ততক্ষণে বস্তির গায়ে গায়ে ঘরের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রতিদিনের মতো বস্তির মোড়ের হোটেলে হাসানের নাস্তা বরাদ্দ থাকে। হোটেল বয় হাসানকে ডেকে জানান দেয়। মাঝে মাঝে হাসান অস্বস্তি বোধ করে। এভাবে ঋণী হওয়া কি ঠিক হচ্ছে! ফতির বেড়াটা টান দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধে, জলদি পা চালায়। হোটেলের সামনে আসতেই বেয়ারা নাস্তার ঠোঙাটা হাসানকে ধরিয়ে দেয়। এখন বলে খাওয়ার সময় নেই। দেরি হলে মহাজন রিক্সা অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। একপ্রকার দৌড়েই হাঁপাতে হাঁপাতে গ্যারেজে পৌঁছায়। রিক্সাটা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। এই রিক্সাটা তার ভাগ্য ফিরিয়েছে। মহাজনকে বলেই রেখেছে এই রিক্সাটা অন্য কাউকে না দিতে। একদিন পা কেটে যাওয়ায় মহাজন রিক্সাটা অন্য একজনকে দিয়েছিল। ওর খুব মন খারাপ হয়। হারিসের কাছ থেকে মহাজন জানতে পেরে রিক্সাটা আর কাউকে দেয় না। একদিন হাসানের মতো, বাবার উপরে রাগ করে এই ঢাকা শহরে এসেছিল। তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত। অভাবের সংসার। স্কুল ফাঁকি দিয়ে ডাংগুলি খেলত, পরীক্ষার ফলাফলে বাবার খুব রাগ হয়। মাইর-ধোর করে। বাবার ইচ্ছা ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর। ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে যায়। শ্রম আর সততা দিয়ে আজ একটা গ্যারেজের মালিক- দশখানা রিক্সা। যদিও লেখাপড়া আর হয়নি। হাসানের সততা আর শিক্ষার মহাজনের একটা মহানুভূতি আছে। হাসান কোমরের গামছা খুলে রিক্সাটা

ভালো করে মোছে। মহাজন দেখে মিটিমিটি হাসে, বলেই ফেলে-

- যেন ঘরের বউয়ের মত আদর কর। হাসান হেসে হেসে উত্তর দেয়,

- ছি ওস্তাদ আমার ভাগ্যের চাবি- দোয়া করবেন। হাসান রিক্সার প্যাডেলে পা রাখে- একটানে আগারগাঁও চলে আসে। বাজারের কাছাকাছি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুবিধেমত খ্যাপ না পেয়ে রেডিও অফিস বাঁদিকে রেখে শের-ই-বাংলা বালিকা বিদ্যালয়ের কাছাকাছি আসতেই একটা ছেলে হাত ইশারায় ডাক দেয়। ছেলেটি বলে- চিড়িয়াখানায় যাবে?

হাসান মাথা ঝাঁকায়। ছেলেটি দরদাম না করে দ্রুত রিক্সায় উঠে বসে। হাত ইশারায় একটি মেয়েকে ডাকে। মেয়েটি এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্রুত এসে রিক্সায় উঠে পড়ে। চোখে মুখে ভয়। কাঁধে স্কুলের ব্যাগ। ছেলেটি বললো- এই রিক্সা তাড়াতাড়ি চল। হাসান বুঝতে পারে প্রেমিক-প্রেমিকা। না হলে এসময় স্কুল ফাঁকি দিয়ে চিড়িয়াখানায় যায়! মনে পড়ে মোমেনা আর সে এমন করে কতদিন যে স্কুল ফাঁকি দিয়ে নদীর কিনারে কাশবনে যেত। হাসান মনে মনে হাসে- হায়রে সময় কতকিছু না করায়- আর কত কিছু বলাতে যায়। হাসান দ্রুত পায়ে প্যাডেল ঘুরায়- বাস, ট্রাক, কার আর রিক্সার ফাঁক দিয়ে প্রায় উড়ে চলে। আগারগাঁও থেকে মাত্র পঁচিশ মিনিটে চিড়িয়াখানার গেটে পৌঁছে যায়। নাক-চোখ-মুখ দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে হাসানের- সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অবচেতন মনেই প্রেমিক যুগলের প্রতি একটা টান অনুভব করে। ওরাও হাফ ছেড়ে বাঁচে। চেহারায় স্বস্তির ছায়া। ছেলেটি টাইট জিন্সের প্যান্টের পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে হাসানের হাতে গুজে দেয় বলে-

- থ্যাংক ইউ, পুরোটাই তোমার। হাসান ওয়েলকাম বলতে গিয়েও থেমে যায়।

ওরা এক ঠোঙা বাদাম কিনে- টিকেট কেটে ভিতরে চলে যায়। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে- দীর্ঘশ্বাস নেয়। আবারও মোমেনার কথা মনে পড়ে। একটা বয়স আসে যখন ছেলে-মেয়েরা লুকিয়ে প্রেম প্রেম খেলা করে। কারোটা স্থায়ী হয়- কারোটা সমাজ-সংসার, ধনী-গরীব ভেদাভেদের

খোদাই করা ছোট
একটা কাঠের বাক্স।
মায়ের গহনার বাক্স।
একটা সোনার চেইন
এক জোড়া কানের দুল
হাসানের হাতে তুলে
দিয়ে বলেছিলো,
তোর বাবার
স্মৃতি- প্রয়োজনে
কাজে লাগাস।
মা বাকিটুকু বলতে
পারেনি- চোখের
পানিতে ভরে গিয়েছিল।
হাসান প্রথম দু'দিন বাড়ি
থেকে আনা একটু চিড়া
আর পানি খেয়েছিল।
হাসানেরও চোখ
ঝাপসা হয়ে আসে।
কাপড়ের আরো একটা
থলি বের করে।
হাতে ধরে অনুমান
করে বেশ ভারি হয়েছে।
লুঙ্গির গাইট থেকে
আজকের রোজগারের
টাকাগুলো বের করে
দশ টাকা, দুই টাকা,
বিশ টাকার নোটগুলো
আলাদা করে সাজায়।
হিসেব করে দেখে
মোট তিনশত চৌত্রিশ
টাকা- একটা বনরুটি
এক কাপ চা
খেয়েছে শুধু।

বাতাকলে পড়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কখনও এর পরিণতি ভয়াবহ হয়। জীবন দিয়ে সমাজকে বোঝায়- ভালোবাসা অপরাধ নয়। আবার মেয়েটি অন্য কারো ঘরনি। ছেলেটি কিছুদিন ভবঘুরের মতো ঘুরে নূতন কাউকে জুটিয়ে নেয়। মেয়েটি কেঁদে বুক ভাসায়। একসময় সবই স্মৃতির মোড়কে বাঁধা হয়। বিষকাঁটার মতো কখনও হৃদয়টাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। হাসানের হঠাৎ মনে পড়ে- সকালের বনরুটি ও কলা জামার পকেটে। পঞ্চাশ টাকার নোটটা কপালে ছুঁইয়ে পকেটে রাখে- ভাগ্য ভালো। পাশেই পাকা চাতালের উপর বসে পড়ে। ফ্লাস্কে করে চা-বিক্রেতার কাছ থেকে দু'টাকার আধা কাপ চা নিয়ে বনরুটি চিবিয়ে খায়। কলাটা রেখে দেয়- পরে খাবে। তার সামনে দিয়ে হাজারো রকমের মানুষ যাওয়া আসা করছে। মোমেনার কথা আবারও মনে পড়ে। পঞ্চম শ্রেণিতেই জানাশোনা, চিঠি চালাচালি। কাঁচা আম চুরি করে খাওয়া। ক্লাস এইট পর্যন্ত ভালোই চলছিল। কখন যে দুটি হৃদয় কাছাকাছি হয়ে গেছে- ওরা বুঝতেই পারে না। একদিনও কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারত না। ক্রমশ। স্কুলের বন্ধুবান্ধবের গণ্ডি ছাড়িয়ে পাড়া প্রতিবেশীর কানে যায়। কেউ বা ভরসা দেয়। কেউ বা এড়িয়ে যায়। হাসান নবম শ্রেণিতে পরীক্ষা দেবার পরই তার ভাগ্য আকাশে নেমে আসে ঝড়। বাবা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। সংসারে মা আরও ছোট ভাই বোনসহ পাঁচজন। বাধ্য হয়ে সংসারের হাল ধরতে গিয়ে বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করতে হয়। অভিজ্ঞতার সেখানে অনেক লস হয়। দেনা শোধ করতে, জমি জমা বিক্রি করতে হলো- বসত বাড়িটুকু ছাড়া শূন্য হাত। লেখাপড়া আগেই বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়- তবুও চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সময়মতো ফি জমা দিতে না পারায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া হলো না। মোমেনা ম্যাট্রিক দিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। হাসান খেয়াঘাটের একটা হিসেবের কাজ পেলেও স্থায়ী হয়নি। কারণ ঘাট দখল নিয়ে প্রায়ই মারামারি হয়। তাছাড়া উন্নয়নের জোয়ারে খেয়াঘাট বেরিঘাট হল। শুরু হলো যজ্ঞশ্রীতি। মাথার উপর বটবৃক্ষ না থাকলে যা হয়। হাসান আবার বেকারত্বের কলে পড়ে গেল। তবুও তাদের

প্রেম থেমে থাকেনি। দিন দিন মা অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসান এখন পূর্ণ যুবক। আকারে ইংগিতে একদিন মাকে মোমেনার কথাটা জানায়। তাছাড়া মোমেনার বাবা নিশ্চয়ই একটা পক্কি করে দেবে- হাসানরা খদ্দকার একটা অহংবোধ তো আছেই। হাসানের মা ভাবে নিশ্চয়ই মোমেনার বাবা তার কথা ফেলতে পারবে না। অসুস্থ শরীর নিয়ে মোমেনার বাবার কাছে কথাটা বলতেই মোমেনার বাবা মুখটা কালো করে ফেলে বলে- ভাবী প্রস্তাবটা দেবার আগে একটু ভেবে দেখলেন না? বেকার-সম্বলহীন ছেলের হাতে কিভাবে মেয়েকে তুলে দেই। মানলাম বন্ধুর ছেলে- দিনকাল বদলে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষার কথা তো বাদ দেয়া যায় না।

- হু, বুঝেছি ভাই সবই ভাগ্য। দেখি কি করা যায়। হাসানের মা উঠে দাঁড়ায়। আর ওরা দুজন দুজনকেই পছন্দ করে। তখন কিন্তু-

হুকোর একটা লম্বা টান দিয়ে বলে- কি যে বলেন ভাবী। হাসানের মত সৎ, ভদ্র দশগ্রামেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

- তাহলে আসি,

- সে কি একটু চা খেয়ে যান।

তাপ্তে থাকলে পরে খাব। হাসানের মা চলে যেতেই মোমেনার বাবা একটা বাঁকা হাসি দেয়। কলেজে পড়া মেয়েকে নিয়ে তার কত স্বপ্ন। যদিও এই খদ্দকার পরিবারের সাথে আত্মীয়তা আগে ভাবতেই পারেনি। দিনবদলের সাথে পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিকতাও বদলে যায়। হাসান বিষয়টা জেনে কষ্ট পেলেও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। যেমন করে হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনে আবার মাট্রিক পরীক্ষা দেবে। এসব ভাবনায় সূর্য কখন যে পশ্চিমে হেলে পড়ছে খেয়াল করেনি। কাজলের মাঝামাঝি আকাশে হালকা মেঘ। লোকজন চিড়িয়াখানার গেইট দিয়ে বেড়িয়ে আসছে। অনেক ভীড়ের মাঝে একটা চেনা মুখ, ওর দৃষ্টি আটকে যায়। কাছে আসতেই বুকটা ধক্ করে কেঁপে ওঠে। মোমেনা- গ্রামের সহজ সরল মেয়েটা যে তার হৃদয়ের সবটুকু দখল করে আছে। কিন্তু কেশভূষা কেমন পাল্টে গেছে। ঘাড়ের কাছে খাটো চুল, হাতকাটা ব্লাউজ, মুখে পাঢ় প্রশাধনীর প্রলেপ, পাঢ় লিপিস্টিক, সাথে স্যুটপরা আধা বয়সী এক পুরুষ, দুজনে খুব ঘনিষ্ঠভাবে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসছে। হাসান তাড়াতাড়ি গামছাটা দিয়ে মুখ ঢেকে অন্যদিকে ঘুরে বসে। ওরা একদম পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হাসানের হৃদপিন্ডটা কেমন অশান্তভাবে দোল খাচ্ছে। একহাতে বুকটা চেপে ধরে। মোমেনার পায়ের হিলের এক একটা শব্দ বুকের মধ্যে প্রেত্রক ঠুকে দিচ্ছে। ওর অশোভন হাসির ঝিলিক অঙ্গভঙ্গি বুঝাচ্ছে- হয়তো ওর স্বামী। চাতাল পার হতেই একটা লাল প্রাইভেট কার ওদের সামনে এল। ড্রাইভার দরজা খুলে ধরল। একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। হাসান নির্বাক, চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেছে। বিকেলের সোনালি রোদ ওর চোখ-মুখে। সকালের সেই কপোত-কপোতি সহাস্যে ওর সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছে। হঠাৎ ওর ঘোর কাটে- আরে রিক্সাওয়ালা ভাই তুমি- আবার খ্যাপ নিয়ে এসেছ? হাসান কি উত্তর দেবে ভাবছিল। ছেলেটি বললো-

-আমাদের আবার আগারগাঁও পৌঁছে দিতে পারবে? হাসান মাথা কাত করে সায় দেয়। মেয়েটি বললো, একটু পরে আব্বার অফিস থেকে আসার সময়। ছেলেটি বললো, বৃষ্টি হতে পারে। রিক্সার পর্দা টানিয়ে দেবে। বরং সবার আগেই ফিরি। ওরা রিক্সায় উঠে বসে ছেলেটি বললো, ভাই একটু দ্রুত চালাতে হবে। হাসান আবারও মাথা কাত করে। ততক্ষণে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। হাসানের চোখেও বৃষ্টির ধারা। বার বার মোমেনার হাসির শব্দ কানে আসছে। দশ মিনিট গোলচত্বর আসতেই একটুর জন্য বাসের সাথে ধাক্কা লাগেনি। ওদের খুনসুটি থেমে যায়। মেয়েটি অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যায়। ছেলেটি আবারো পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দেয়। হাসান বলে- লাগবে না। ছেলেটি জোর করে ওর পকেটে গুজে দেয়। হাসান গামছা দিয়ে মুখ মুছে নেয়- দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে- আর টাকা দিয়ে কি হবে? ছেলেটি বলে- আবার দেখা হবে ভাই। ওরা দুজন দুদিকে চলে যায়। হাসান কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে রিক্সাটা কোনরকম টেনে চলে- ওর শরীরের সমস্ত শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। মহাজনকে টাকা বুঝিয়ে রিক্সাটা গ্যারেজে রেখে ও ধীর পায়ে ওর একান্ত আলয়ে চৌকিটার উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। ভেজা চুল- ভেজা শার্ট- ভেজা ঝাপসা চোখে ঘরের চালার ফুটা দিয়ে সন্ধ্যার বৃষ্টিভেজা আকাশটা দেখে। হাসানের আর কোন চাওয়া নেই পাওয়া নেই। অন্ধকার ঘরে বুকের উপর হাত রাখতেই পকেটে রাখা মোমেনার ছবির অস্তিত্ব অনুভব করে। উঠে বসে পকেট থেকে ছবিটা বের করে- সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে, মোমেনা তুমি ঠিকই করেছ। অর্থ যেমন মানুষের চাহিদা মেটায় তেমনি ভালোবাসায় মৃত্যু হয়। হাসানের কপালের চামড়া কুঁচকে যায়। ইচ্ছেমত ছবিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। রাতেই সব ছড়িয়ে রাখে। সকালে হারিসের ঘুম ভাঙতে দেখে- হাসান তার সুটকেস নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। চোখগুলো কোলা-লাল হয়ে আছে। ইচ্ছা থাকলেও হারিস কোন প্রশ্ন করে না কারণ কয়েকদিন আগেই মোমেনার একটা চিঠি এসেছে- এই তার শেষ চিঠি উপরে লেখা। ইচ্ছা করেই চিঠিটা হাসানকে দেয়নি- তাহলে? নিরবতা ভেঙে হাসান বললো হারিস ভাই চলে যাচ্ছি। আপনার কথা ভুলব না। আমার ভালবাসার যে মূল্য আপনি দিয়েছেন তার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না। আর হাসানের গলা ভার হয়ে আসে- প্রয়োজন হবে না। চোখ ঝাপসা আমার হাতার চোখ মুছে- বেঁচে থাকলে দেখা হবে- আসি। হারিস ওর গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে- দীর্ঘ একটা শ্বাস নেয়। এইতো জীবন- ভালোবাসা, মায়া মমতার বন্ধনে যেমন একে অপরকে জড়িয়ে রাখে তেমনি ছিন্ন করতেও সময় লাগে না। ধীর পায়ে ওর ঘরে ঢোকে। মোমেনার টুকরা করা ছবিটা সারা ঘর ছড়ানো। হয়তো ওর ভালোবাসার পাখিটা উড়ে অন্য কারো খাঁচায় বন্দি। হারিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর চোখটাও ঝাপসা হয়ে ওঠে।

লেখক কথাসাহিত্যিক

তোমার দু'চোখে চোখ রেখে

আ. শ. ম. বাবর আলী

তোমার দু'চোখে চোখ রেখে আমি
পৃথিবীর ইতিহাস পড়ি-
অজন্তা ইলোরা থেকে ম্যাডোনা মোনালিসার
ছবি দেখি
তোমার দু'চোখের চিত্রপটে।

তোমার দু'চোখে চোখ রেখে আমি
পৃথিবীর ইতিহাস পড়ি-
অনন্ত সামুদ্রিক জাহাজে আমি কলম্বাস হয়ে যাই,
আবিষ্কার করি এক নতুন ভূ-ভাগ।

তোমার দু'চোখে চোখ রেখে আমি
পৃথিবীর ইতিহাস পড়ি-
মহাশূন্যযানে পাড়ি দেই অসীম আকাশ,
পৌঁছে যাই শুক্র, শনি অথবা
মঙ্গলগ্রহে।

তোমার দু'চোখে চোখ রেখে আমি
পৃথিবীর ইতিহাস পড়ি-
এবং এমনি করে আদিম মানব থেকে
পৌঁছে যাই
সভ্যতার সুবর্ণ যুগে।

ভালোবাসার পরগনা

ফখরুল করিম

তোমার ওই চোখ, দুনিয়ার ভালোবাসার এক রাজ্য
ওখানে লুকিয়ে আছে আমার না দেখা এক সাম্রাজ্য
জীবনে কিছু চাইনি, এখন কুঁড়েঘরে আমার বসবাস
ভালোবাসি বলতে পারিনি, সুখ দুঃখে ভরা হৃদয়াকাশ।

কোন একদিন দিগন্তপ্রসারী মাঠে বলেছিলে ভালোবাসি
সেই থেকে যেন জীবনের এক অধ্যায়ে প্রবেশ করে আসি।
এখন জীবনের ভাসিলে চলছে মন এক অজানা গন্তব্যে
তোমার পাওয়া স্পর্শে জীবন হয়েছে ধন্য নানা মন্তব্যে।

অপেক্ষার প্রহর কাটে কাশবনে ভরে মায়াবী জোছনায়
অপেক্ষায় আছি, জানি আসবে না এই পুরনো পরগনায়
শূন্যতায় বিদগ্ধ হৃদয়ে চলে কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব
তোমার ভালোবাসার সারণীতে আমি এক অদ্ভুত মানব।
অতীতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলি ভালোবাসি
শত ব্যস্ততায় বলি- ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।

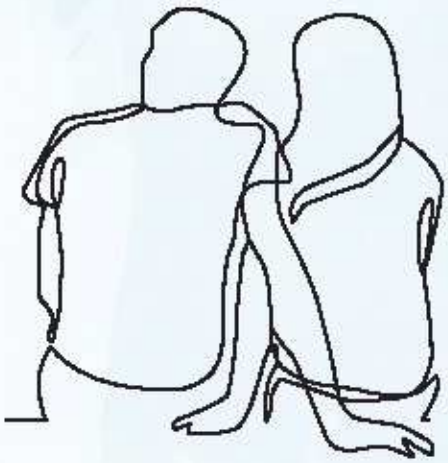

গণসম্প্রচারের ইতিবৃত্ত (১৯২২ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (প্রথম পর্ব)

দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব

আজ থেকে প্রায় ৬০০ বছর আগের কথা। উত্তর ইউরোপের জার্মান অঞ্চল। ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দের এক শুভ্র সকাল। এমন দিনে জোহান গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন লেখা ছাপানোর অবাক করা এক মেশিন। সবাই বলছে প্রিন্টিং প্রেস। তথ্য সঞ্চয় ও বিতরণের অসাধারণ উদ্ভাবন। এখন হাতে না লিখলেও, প্রকাশ হবে বই। পুঞ্জিভূত অভিজ্ঞতার হবে অসংখ্য লিখিত প্রকাশ। অস্পৃশ্য বহু আরাধ্যের ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেল প্রান্তিক মানুষ। মূলত, ছাপাখানা যন্ত্রের আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে দিল গণযোগাযোগের অসাধারণ শক্তি। সমাজে পুস্তক, সাময়িকী, প্রবন্ধ সংকলন, গবেষণা সংকলন, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন এসব কিছু হয়ে উঠতে লাগল সহজলভ্য। বহমান সময় আর মানুষের কর্মপ্রয়াসে ধীরে ধীরে উদ্ভাবন হতে লাগল ক্যামেরা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফনোগ্রাফ আর কিনা। এগুলো থাকে সময়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ঘটল বেতার যন্ত্রের উদ্ভাবন। এরপর উদ্ভাবনের খাতায় যুক্ত হলো টেলিভিশন। বেতার ও টেলিভিশন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার মানব সভ্যতার নিয়ে এলো অসম্ভব গতি। নাগরিক জীবনের প্রতিটি পরতে গণসম্প্রচারের প্রভাব আজ পরম বাস্তবতা। আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি থেকে শুরু করে জাতীয় অর্জনের প্রতিটি বার্তা এ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়ে দিতে এ দেশের বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম ভূমিকা রাখার প্রয়াস রচনা করেছে সতত।

গণসম্প্রচার কার্যক্রমের সূচনার দিনগুলো থেকেই মূলত: দুই ধরনের সম্প্রচার মডেল বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে। একটি হচ্ছে 'বাণিজ্যিক সম্প্রচার' মডেল এবং অপরটি হলো অলাভজনক ভিত্তিতে জনস্বার্থে পরিচালিত 'পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং' যা বলা যেতে পারে 'জনসেবার সম্প্রচার' মডেল। সময় প্রবাহে পুরো ইউরোপ জুড়ে দ্বিতীয় মডেলটি বিকাশ ও প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশসহ আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে মূলত দ্বিতীয় মডেল থেকেই সম্প্রচার কার্যক্রম কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে

১৯২০-এর দশকে বেতার সম্প্রচারের সূত্রপাত ঘটে। মানুষ নতুন মিডিয়া হিসেবে বেতারযন্ত্রের সক্ষমতায় ভীষণভাবে অভিভূত। ব্যাটসম্যান এবং অন্যান্যদের (২০১০) মতে, আমেরিকায় বেতার যন্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রভাব 'ওয়্যারলেস ফিভার' নামে খ্যাতি লাভ করে। ফলশ্রুতিতে, আমেরিকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র KDKA পিটসবার্গে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সময়ের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল (রুকিন-২০১১)।

গ্রেট ব্রিটেনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গণসম্প্রচারের জন্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিঃ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিকানা ছিল মার্কোনি হাউস, ২অলও, লন্ডন। প্রথম সম্প্রচার হয় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর। জন রিথ ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ব্রিটিশ ও আমেরিকার প্রভাবশালী কোম্পানিসমূহ যথা: দি মার্কনি কোম্পানি, জেনারেল ইলেকট্রিক, আমেরিকান টেলিফোন এন্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানির মতো কর্পোরেট জায়ান্টরা বাণিজ্যিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি গড়ে তোলেন। কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল দেশব্যাপী জাতীয় রেডিও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিকানার ভিত্তিতে সারা দেশে একাধিক মালিকানায় অসংখ্য ট্রান্সমিশন স্টেশন স্থাপন ছিল এর কৌশল। পরবর্তীতে, যৌথ ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় সম্প্রচার সেবা প্রদান করাই ছিল কোম্পানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোম্পানির মূল লাভের সূত্র ছিল রেডিও সেট বিক্রি এবং লাইসেন্স ফি ও এর নবায়ন ফি। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী রেডিও সেটের বিক্রির অপ্রতুলতা কোম্পানির প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। পরবর্তীতে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার জন রিথ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে জনস্বার্থে জাতীয় বেতার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তদবির শুরু করেন। জন রিথ মনে করতেন সম্প্রচার একটি জাতীয় সেবা। এর জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যয় হলো জনকল্যাণে একটি দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ। তিনি এই ব্যয়কে খরচের খাতায় না বসিয়ে বরং সমাজ উন্নয়নে জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে আখ্যায়িত করতে আগ্রহী ছিলেন। মুনাফার অপ্রতুলতার কারণে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নিজস্ব অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। এ সময়ে কোম্পানির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ এবং ব্রিটিশ জনজীবনে সম্প্রচারের ভবিষ্যৎ প্রভাব নিরূপণ নিয়ে মতামত প্রদানের জন্য ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্যা কমিটি অন ব্রডকাস্টিং গঠিত হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন Earl of Crawford and Balcarres। তাই, এই কমিটি ক্র্যাফোর্ড কমিটি নামেও পরিচিতি লাভ করে। ক্র্যাফোর্ড কমিটি কর্তৃক ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মার্চ ক্র্যাফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে সম্প্রচার কার্যক্রমকে একটি 'পাবলিক সার্ভিস' হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। একই সাথে সমগ্র ব্রিটেন জুড়ে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজকীয় সনদের দ্বারা ঘোষিত একটি ট্রাস্টিশিপ-এর অধীনে অলাভজনক ভিত্তিতে পাবলিক কর্পোরেশন দ্বারা সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। ক্র্যাফোর্ড কমিটি'র এই প্রতিবেদনকে পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং বা জনসেবার সম্প্রচার কার্যক্রমের সার্বজনীন ঘোষণা বলা যেতে পারে। এই ধারণাটিই মূলত সময়ের আবর্তে জনসেবায় সম্প্রচার মডেলের মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আনুষ্ঠানিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয় ২৩শে জুলাই ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে। এইদিন ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড (IBC) বোম্বেতে প্রথম সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ইরউইন। ভারতে বেতার সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলোর অবদান প্রশংসাযোগ্য। এসব কোম্পানির আর্থিক সহায়তায় তখন বোম্বে, কোলকাতা ও মাদ্রাজের মত বড় বড় শহরগুলোতে সম্প্রচার সম্পর্কে সাধারণ ভোক্তাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বেশ কিছু রেডিও ক্লাব গড়ে উঠে। বোম্বে প্রেসিডেন্সি রেডিও ক্লাব এমনই একটি ক্লাব। গায়চান্দ মোতওয়ানি (Giachand Motwane) এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন, ভারতবর্ষে যিনি প্রথম রেকর্ডেড অনুষ্ঠান বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে প্রেরণে সক্ষম হন। কাজটির নির্দিষ্ট দিন তারিখ লিপিবদ্ধ না থাকলেও, ধারণা করা হয় কাজটি তিনি করেছিলেন বিশের দশকে। পরবর্তীতে, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে যৌথভাবে টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকা ও বোম্বে পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিস। একই সময়ে ব্রিটেনের মার্কনি কোম্পানি লিমিটেড কোলকাতা শহরে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রের সম্ভাব্যতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রেখেছিল। এ সময়ে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার জন রিথ লন্ডনের 'ইন্ডিয়া অফিসে' ভারতীয় সম্প্রচার কার্যক্রম 'ব্রিটিশ মডেল' অনুসরণে বাস্তবায়নের জন্য তদবির করতে থাকেন। তিনি বলেন যে, সমগ্র ভারতব্যাপী বিভিন্ন স্থানে সম্প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে এটি ভারতীয় সাম্রাজ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন স্থানের মধ্যে একটি সংযোগকারী মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠবে। এতে করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জনপদকে প্রধান প্রধান শহরগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে রাখা সম্ভব হবে। জন রিথের (১৯৪৯) আত্মস্মৃতি 'ইয়েস দ্যা উইন্ড'-এর বর্ণনা অনুসারে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে তার এই ভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটান। পরবর্তীতে, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড ইরউইনের নিকটও তার এই ভাবনার কথা জানান এবং সম্প্রচারের ব্রিটিশ মডেল অনুসরণে ভারতীয় উপমহাদেশে সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানান। জন রিথ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, মূলত ১৯২১-২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ড-এর ভারতে রাজকীয় সফরের সময় থেকেই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিশালী বীজ স্পষ্ট হতে শুরু করে। মূলত

এই সময় থেকেই ব্রিটিশ ভারতের জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চিত উপনিবেশিকতাবিরোধী বোধ সম্মিলিত প্রতিবাদ আকারে প্রকাশ পেতে শুরু করে। জনগোষ্ঠীর এই প্রতিবাদ এবং উপনিবেশিকতাবিরোধী মনোভাব ব্রিটিশ ভারতের শাসকদের ভাবিয়ে তোলে। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার 'বেতার সম্প্রচার'-এর ক্ষমতা সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী আগে থেকেই অবগত। বিশেষ করে লন্ডনের নয় দিনব্যাপী জেনারেল স্ট্রাইক প্রশমনে জন রিথের নেতৃত্ব এবং বেতার সম্প্রচারের তাৎক্ষণিক প্রচার সক্ষমতা সম্পর্কে তারা পূর্ব থেকেই অবগত। তথাপি, তৎকালীন ভারত সরকার পাবলিক ব্যয় মঞ্জুরি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ ভারতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্প্রচারের ব্রিটিশ মডেল অনুসরণের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনের উপযোগী সরকারি প্রশোসনা যতটা সম্ভব কমিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যথোপযুক্ত সুবিধা প্রদান করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমার্শিয়াল লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কাজের জন্য তারা সাম্প্রতিক সময়ে গঠিত ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানিকে যথার্থ হিসেবে বিবেচনা করেন। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে জন রিথ খুবই হতাশ হন। তিনি বুঝতে পারেন, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে তার অনুরোধ এবং লর্ড ইরউইন বরাবর তদবির আক্ষরিক অর্থে কোন কাজেই আসেনি। পরবর্তী সময়ে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি সম্পর্কিত ভারত সরকারের পরিকল্পনা লন্ডন পার্লামেন্ট থেকে অনুমোদিত হলে, তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বার্কেনহেড ভারতের ভাইসরয় লর্ড ইরউইন বরাবর ভারতীয় উপমহাদেশে সম্প্রচার বিষয়ে তার মতামত জানিয়ে একটি পত্র লিখেন। বার্কেনহেড ভারতে সম্প্রচার বিষয়ে জন রিথের প্রস্তাবনার সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, সম্প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অঞ্চলকে সংযুক্তকারী একটি সম্প্রচার লিংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে আধুনিক শহর পর্যন্ত সবাই এক সাথে যুক্ত থাকবে। তিনি বলেন, যদি সম্প্রচারের মাধ্যমে প্রতিটি প্রত্যন্ত গ্রামকে সংযুক্ত করা যায় এবং জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় এই সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, তবে তা হবে অসাধারণ। এর মাধ্যমে যদি যথাযথ সরকারি সহায়তায় এবং সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান বিনির্মাণ এবং প্রচার করা যায়, যাতে করে সঠিক তথ্যের যথাযথ প্রচার এবং বিপজ্জনক অসত্য গুজব প্রতিরোধ করা যায়, তবে তা হবে সত্যিই খুবই অসাধারণ। এ ক্ষেত্রে তিনি ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি তার চিঠিতে লিখেন, "আমি যা বুঝতে পারছি, আইবিসি'র প্রতি যে মনোপলি আগামী পাঁচ বছরের জন্য দেয়া হবে এবং এর ফলে এরা মূলত ইংরেজভাষী জনগোষ্ঠী এবং শিক্ষিত ভারতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য শহরে অঞ্চলে অনুষ্ঠান প্রচার করবে। বম্বে এবং কলকাতা শহরে আইবিসি'র যে সম্প্রচার ভবন স্থাপন করা হবে এর প্রতিটির কাভারেজ এরিয়ার ব্যাসার্ধ ১০০০ মাইল হলেও এই সক্ষমতা দিয়ে সমগ্র পাঞ্জাব এবং এবং ক্রশিয়ার প্রদেশে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।" তিনি আরো লিখেন, "যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য ধরে আমরা তীরে পৌঁছুতে চাইছি, সে কিন্তু বড় বা ছোট শহরে অথবা মফস্বলে বাস করে না। বরং এ ধরনের ব্যক্তিরা সবচেয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাস করেন এবং এরা সবচেয়ে বেশি ভুল তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারেন।" তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, "আমার এটাও সত্য যে, এই ধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যদি সফলভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়, তবে তা সবচাইতে কার্যকরী ফলাফল বয়ে আনবে।" তিনি তৎকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেন, মূলত শহর অঞ্চলে ইংরেজি ভাষা খুবই প্রচলিত। সুতরাং শহরে নতুন করে ইংরেজি ভাষায় কিংবা নির্দিষ্ট ভারতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য স্বদেশীয় ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার কোন আলাদা প্রভাব বলয় তৈরি করবে না। বরং কার্যকর ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রভাব বলয় তৈরির জন্য প্রতিটি প্রধান জনগোষ্ঠীর স্বদেশীয় ভাষায় অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের জন্য স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যকীয়, যাদের

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আইবিসি 'রেঞ্জ এন্ড রিচ ক্রাইসিস' অর্থাৎ কাভারেজ এরিয়ার বিস্তৃতি এবং আনুপাতিক প্রত্যাশিত গ্রাহক সংখ্যাহীনতার সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সেই সময়ে বেতার সেটের দাম এবং লাইসেন্স ফি সাধারণ মানুষের জন্য ছিল আকাশছোঁয়া। যা কেবলমাত্র বোম্বে এবং কলকাতার মত বড় শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের পক্ষেই ভোগ করা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে, ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির অর্থায়ন সংকট আশংকাজনক অবস্থায় পৌঁছায় এবং ১লা মার্চ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে আইবিসি দেউলিয়া ঘোষিত হয়। প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে আইবিসি সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আইবিসি'র ব্যর্থতার পর ভারত সরকার ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার-এর অধীনে ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (আইএসবিএস) নামে ১লা এপ্রিল ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে।

লক্ষ্য দল হবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আইবিসি 'ব্রেক এভ রিচ ক্রাইসিস' অর্থাৎ কাভারেজ এরিয়ার বিস্তৃতি এবং আনুপাতিক প্রত্যাশিত গ্রাহক সংখ্যাহীনতার সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সেই সময়ে বেতার সেটের দাম এবং লাইসেন্স ফি সাধারণ মানুষের জন্য ছিল আকাশছোঁয়া। যা কেবলমাত্র বোধে এবং কলকাতার মত বড় শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের পক্ষেই ভোগ করা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে, ফেব্রুয়ারি ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির অর্থায়ন সংকট আশংকাজনক অবস্থায় পৌঁছায় এবং ১লা মার্চ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে আইবিসি লেটেলিয়া ঘোষিত হয়। প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে আইবিসি সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আইবিসি'র ব্যর্থতার পর ভারত সরকার ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার-এর অধীনে ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (আইএসবিএস) নামে ১লা এপ্রিল ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। মূলত এই উদ্যোগের ফলে আইবিসি'র সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করে। ভারত সরকারের এই উদ্যোগ সম্প্রচার বিষয়ে তার পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে আসার প্রচেষ্টা ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর ব্রিটিশ ভারতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য যুদ্ধ পরবর্তী রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটির নির্দেশনা থেকে মূলত ভারত সরকার সরে আসে। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিবিসি'র আদলে জনগণের অর্থায়নে বেতার ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার প্রথম উদ্যোগ এটিকে বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে পেছনে ফেলে জনস্বার্থে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার একটি উদ্যোগ হিসেবেও এটিকে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু সম্প্রচারের নীতিগত এই অবস্থান খুব বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী ভয়াল অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় অর্থ যোগানের অপ্রতুলতার কারণে প্রতিষ্ঠার ১৮ মাসের মাথায় ৯ই অক্টোবর ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে অনিবার্যকারণে তাৎক্ষণিকভাবে আইএসবিএস বন্ধ ঘোষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, দ্বিতীয়বার ভারতীয় উপমহাদেশে বেতার সম্প্রচার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্যর্থ হলো। প্রথমদিকে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে তারা আরো গভীর পর্যালোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মূল্যায়নভিত্তিক সম্প্রচার কার্যক্রমকে চলমান রাখতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ভারতবর্ষে বেতার সম্প্রচার চলমান থাকবে। এরপর থেকে অবশ্য ভারতে বেতার সম্প্রচারের ধারাবাহিকতার বিঘ্ন ঘটতে আর দেখা যায়নি।

বিবিসি'র সফলতাকে বিবেচনায় নিয়ে ভারত সরকার এ অঞ্চলে বেতার সম্প্রচারকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রতিষ্ঠানিকভাবে বিবিসি-কে অনুরোধ জানায়। এরই প্রেক্ষিতে, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রথম ডিরেক্টর অব ব্রডকাস্টিং হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন বিবিসি'র কর্মকর্তা লিউনেল ফিল্ডেন। তিনি ভারতবর্ষে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন পদটিও অলংকৃত করেছিলেন। লিউনেল ফিল্ডেন ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির পতনের পর গঠিত ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (আইএসবিএস) সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক নাম নিয়ে কিছুটা হতাশ ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন এমন একটি নাম যা সাধারণ শ্রোতার নিকট সহজে বোধগম্য হবে। মানুষ সহজে নামটি বলতে পারবে এবং ছড়াতে পারবে। ফিল্ডেন-এর বিবেচনায় ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস নামটি মোটেই শ্রোতাবান্ধব নয়। এক্ষেত্রে তার প্রস্তাবিত সহজ ও সর্বজনবোধগম্য 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নামটি প্রথম প্রস্তাবনায় ভারত সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। ফিল্ডেন তাঁর আত্মজীবনী 'দ্যা ন্যাচারাল বেন্ট' (১৯৬০) গ্রন্থে বিষয়টির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'All India Radio' নামটি ভারতব্যাপী প্রসারণের জন্য তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো'র নিকট তদবির করতে হয়েছিল। ফিল্ডেন-এর মতে, ইংরেজি 'Broadcasting' শব্দটি স্থানীয় জনগণের জন্য অত্যন্ত কঠিন। ফিল্ডেন-এর ভাষায় ভারতীয়দের জন্য 'আনপ্রনানসিয়েবল' শব্দ। তার মতে ইন্ডিয়ান স্টেট শব্দ দুটিও সর্বভারতীয় আবেদন তৈরি করে না। ১৭ই এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো বম্বে এসে পৌঁছান। লর্ড লিনলিথগোর ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে নতুন ভাইসরয়ের সম্মানে আয়োজিত প্রথম নৈশভোজে প্রথম সাক্ষাতেই ফিল্ডেন বিষয়গুলো নিয়ে লর্ড লিনলিথগোর সাথে আলোচনা করেন। লিনলিথগো পুরো বক্তব্য শুনেন এবং ফিল্ডেনের বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুধাবন করেন। লিনলিথগো ইন্ডিয়ান স্টেট শব্দ দুটির পরিবর্তে অল ইন্ডিয়া শব্দ দুটি তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চারণ করেন। ফিল্ডেন শব্দ দুটি শুনে উচ্ছ্বসিত হন এবং লিনলিথগোর প্রস্তাবনার প্রশংসা করেন। তিনি সাথে সাথে বলেন, চমৎকার প্রস্তাবনা। তবে, পুরো নামটি অবশ্যই অল ইন্ডিয়া ব্রডকাস্টিং হওয়া উচিত নয়। ফিল্ডেনের প্রশংসায় লিনলিথগো খুবই প্রাণিত বোধ করেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবনার পর, লিনলিথগো অল ইন্ডিয়া রেডিও নামটিই প্রস্তাব করেন। ফিল্ডেন 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' প্রতিষ্ঠানটির নাম 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' ধারণ করায় অত্যন্ত আনন্দিত হন। ফিল্ডেন-এর মতে, 'সর্বজন অনুসরণযোগ্য অল ইন্ডিয়া রেডিও নামটি লিনলিথগো নিজস্ব উদ্ভাবন হিসেবে আত্মতৃপ্তি বোধ করলেও এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আগে থেকেই লিওনেল ফিল্ডেন কাজ করছিলেন।' মূলত, লিওনেল ফিল্ডেন এই ভেবে আনন্দিত যে, যেহেতু ইন্ডিয়ান ভাইসরয় নিজে অল ইন্ডিয়া রেডিও নামটির সাথে একমত হয়েছেন সুতরাং সর্বভারতে সকল জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানোর জন্য চমৎকার একটি প্রাতিষ্ঠানিক নাম সৃষ্টি হল। মূলত এভাবেই ৮ই জুন ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নামটির যাত্রা শুরু হয়। (চলবে.....)

লেখক উপপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

বাসন্তী সাজে ঋতুরাজ বসন্ত

শাহান আরা জাকির

বসন্তকাল মানে মহাশান্তি বা প্রশান্তির কাল। এ ঋতু প্রশান্তির মহাডালি নিয়ে হাজির হয়। প্রশান্তি মানে, না আছে শীত আর না আছে গরম। বাংলার প্রবাহমান নদীর স্রোতের মতো বসন্তের উল্লাস সবার জীবনে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ফাল্গুন মাস এলে- যুগ যুগান্তরে হরেক রকম পাখি, গোধূলিময় পৃথিবী ক্রমে শীতল ছায়া, অজস্র রোদের অচিন্তনীয় বিস্তারে প্রাণ ভরে ওঠে। তাই বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্যে, সুরভিত ঘ্রাণে ভরে উঠে সবার হৃদয় প্রাণ।

'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত।' বসন্ত ঋতু নিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি বাঙালি সমাজে খুবই জনপ্রিয়। কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে বসন্ত আগমনের গভীর তাৎপর্য আর এর প্রতি জীবের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন। কবিগুরুর কালচক্রে বসন্তই হলো শেষ ঋতু। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে ফাল্গুন ও চৈত্র এ দু'মাস বসন্তকাল। বসন্ত আসে আবেগঘন ও বর্ণিল আনন্দবার্তা নিয়ে আপন মহিমায়। পহেলা ফাল্গুন বাংলা পঞ্জিকার একাদশতম মাস ফাল্গুনের প্রথম দিন ও বসন্তের প্রথম দিন। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পহেলা ফাল্গুন পালিত হয়। বাংলাদেশে জাতীয় বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ এই দিনকে বরণ করতে চারুকলায় বকুলতলায় এবং ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবর উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিবছর জাতীয় বসন্ত উৎসব আয়োজন করে। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে এ দিন বসন্ত উৎসব পালন করা হয়।

ঋতুর পরিবর্তনে গাছের কচি ডালে নতুন পত্রপল্লব হয়ে ওঠে সুশোভিত। সুরভিত সমীরণে গানের পাখি কোকিলের মনকাড়া মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সুমধুর গান। সে গানের সুর সব ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে, মুখরিত হয়ে ওঠে প্রকৃতি।

বসন্ত মানে অজস্র ফুলের সমারোহ। হাজার রঙের মিলনমেলা। প্রকৃতিতে বসন্ত ছুঁয়ে যাওয়ার কিছু আগেই এ ঋতুর কিছু ফুল

অভেদ্যদূত হয়ে হাজির হয়। ফাল্গুন ফুলের মাস। ফুল ফোটার মাস। কবি বলেছেন, 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক এখন যে বসন্ত'...। সময়টা যে ফুলের সৌরভে সুরভিত। তাই এ ঋতুতে দেশব্যাপী ফুলের সুরভি শীতল সমীরণে ঢেউ তোলে। পুষ্পকাননে ফোটে জুঁই, চামেলি, রজনীগন্ধা, শিমুল, হাসনাহেনা, গোলাপ। কৃষ্ণচূড়ার সবুজ ডালে শোভাবর্ধন করে রক্তের মতো লাল ফুল।

বসন্তকাল মানে মহাশান্তি বা প্রশান্তির কাল। এ ঋতু প্রশান্তির মহাডালি নিয়ে হাজির হয়। প্রশান্তি মানে, না আছে শীত আর না আছে গরম। বাংলার প্রবাহমান নদীর স্রোতের মতো বসন্তের উল্লাস সবার জীবনে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ফাল্গুন মাস এলে- যুগ যুগান্তরে হরেক রকম পাখি, গোধূলিময় পৃথিবী ক্রমে শীতল ছায়া, অজস্র রোদের অফিনীয় বিস্তারে প্রাণ ভরে ওঠে। তাই বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্যে, সুরভিত ঘ্রাণে ভরে উঠে সবার হৃদয় প্রাণ।

এ দিনটিতে প্রকৃতির সাথে সাথে বাসন্তী সাজে সেজে ওঠে বাংলার মানুষেরা। আর শুধু এই বাংলাই নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যাসহ অন্যান্য রাজ্যেও দিনটি বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন আর্য জাতির হাত ধরে এই উৎসবের জন্ম। খ্রিষ্টের জন্মেরও বেশ কয়েকশো বছর আগে থেকে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে এই উৎসবটি। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে পাথরের উপর খোদাই করা এক পাথরে পাওয়া গেছে এই উৎসবের নমুনা।

বাংলায় যেভাবে এলো বসন্ত উৎসব:

পুরীতে ফাল্গুন মাসে যে দোলোৎসব হতো, তার অনুকরণে বাংলাতেও প্রবর্তিত হয় এই উৎসব পালনের রেওয়াজ। বাংলায় বসন্তকালে রাসমেলা বা রাসযাত্রারও প্রচলন হয় মধ্যযুগে। নবদ্বীপ, যেটি মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্য খ্যাত, সেখান থেকেই রাসমেলার উৎপত্তি। বসন্তকালে বাংলাদেশের খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে রাসমেলা হয়ে থাকে। সেখানে কীর্তনগান ও নাচের আসর বসে থাকে। এছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার

আজ যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বসন্তের প্রথম দিন তথা পহেলা ফাল্গুন অন্যতম বৃহৎ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, এর পেছনে অবদান রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের একদল শিক্ষার্থীর। ১৯৯১ সালে কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই বসন্তবরণ উৎসব পালন করেছিল তারা। সেবার পহেলা ফাল্গুনের আগের দিন চারুকলা অনুষদের কিছু মেয়ে শাড়ি কিনে মৈত্রী হলে রাতের বেলা ব্লক প্রিন্ট করে। পরদিন তারা ওই শাড়ি পরে নিজেদের অনুষদে হাজির হয়। বরাবরের মতোই অদূরে বাংলা একাডেমিতে চলছিল অমর একুশে বইমেলা, যা তাদের মাঝে যোগ করে অতিরিক্ত উৎসবের উন্মাদনা।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ফাল্গুনী পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বসন্তকে বরণ করে নিত। ১৫৮৫ সালে সম্রাট আকবর বাংলা বর্ষপঞ্জি হিসেবে আকবরি সন বা ফসলি সনের প্রবর্তন করেন। একইসাথে প্রবর্তিত হয় প্রতি বছর ১৪টি উৎসব পালনের রীতিও। এর মধ্যেই অন্যতম ছিল বসন্ত উৎসব।

বসন্তবরণ উৎসবের ইতিহাস:

আজ যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বসন্তের প্রথম দিন তথা পহেলা ফাল্গুন অন্যতম বৃহৎ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, এর পেছনে অবদান রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের একদল শিক্ষার্থীর। ১৯৯১ সালে কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই বসন্তবরণ উৎসব পালন করেছিল তারা। সেবার পহেলা ফাল্গুনের আগের দিন চারুকলা অনুষদের কিছু মেয়ে শাড়ি কিনে মৈত্রী হলে রাতের বেলা ব্লক প্রিন্ট করে। পরদিন তারা ওই শাড়ি পরে নিজেদের অনুষদে হাজির হয়। বরাবরের মতোই অদূরে বাংলা একাডেমিতে চলছিল অমর একুশে বইমেলা, যা তাদের মাঝে যোগ করে অতিরিক্ত উৎসবের উন্মাদনা।

আনুষ্ঠানিক বসন্তবরণ উদ্‌যাপনের সূচনা:

ঘটনা চারুকলার শিক্ষার্থীদের হাত ধরে হলেও, দ্রুতই বসন্তবরণের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের শিক্ষার্থীরাও। তাই ১৯৯৪ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায়।

শীত চলে যাবে রিক্ত হয়ে, আর বসন্ত আসবে ফুলের ডালা সাজিয়ে। বাসন্তী ফুলের পরশ আর সৌরভে কেটে যাবে শীতের জরা-জীর্ণতা। বসন্তকে সামনে রেখে গ্রামবাংলায় মেলা, সার্কাসসহ নানা বাঙালি আয়োজনের সমারোহ থাকবে। ভালোবাসার মানুষেরা মন রাঙাবে বাসন্তী রঙেই। শীতের সঙ্গে তুলনা করে চলে বসন্তকালের মিঠা উৎসবও।

এই ঋতুতে বায়ু নানা দিক থেকে প্রবাহিত

হয়, কোন নির্দিষ্ট দিকে স্থির থাকে না। উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবাহের পরিবর্তে গ্রীষ্মের দক্ষিণা অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করার এ ক্রান্তিকালে বায়ুপ্রবাহের দুরন্তপনা শুরু হয়। বসন্তের আবহাওয়া থাকে মনোরম, আকাশে কিছু কিছু মেঘ থাকলেও সার্বিক আবহাওয়া থাকে নির্মল। কদাচিৎ মার্চের শেষদিকে দুপুরের পর বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রঝড় সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ ঋতুতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনকে প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে যায়। আত্মভোলা মনে জাগে গান। রক্তবর্ণের শিমুল, পলাশ ও কৃষ্ণচূড়া এ সময়েই ফোটে। আমগাছ সাজে নবমঞ্জরিতে শোভিত হয়ে। ভ্রমর মনের আনন্দে গুঞ্জন করতে করতে সুগন্ধি পুষ্প ও আম্রমঞ্জরির মধুপানে মত্ত হয়। যব, গম, সরিষা ইত্যাদি শস্যে মাঠগুলো রমণীয় শোভা ধারণ করে। বাংলাদেশের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। প্রতিটি ঋতুতেই এই বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য ছড়ায়। তবে বসন্তের সৌন্দর্য উপমাহীন। এর সাথে তুলনা চলে না অন্য কোনো ঋতুর। এমন ফুলেল সময় আর কখনো দেখা যায় না। শীতের জীর্ণতা শেষে প্রকৃতিতে যে উষ্ণতা আসে সেই উষ্ণতায় মানুষের মনও প্রকৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে জেগে ওঠে নতুনের আহ্বানে।

এদিকে, দিনটিকে আরো উপভোগ্য করে তুলতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গ্রহণ করে নানা কর্মসূচি। চারদিকে প্রাণের স্পন্দন, সাজ সাজ রব। কংক্রিটের জঙ্গল পাড়ি দিয়ে বসন্তের দখিন হাওয়া উচ্ছ্বাসের রং ছড়ায় রাজধানীবাসীর মনে। পলাশ রাঙা সকালে দখিনা হাওয়ায় আমের মুকুলের সোনা আমান দেয়, এসেছে ঋতুরাজ বসন্ত। জীবনের এসেছে পূর্ণতা। নতুন প্রাণের কলরব। চারুকলার বকুলতলায়, তাই বসন্ত বরণের উৎসবে টানে, দালানের খোলস ছেড়ে বাসন্তী সাজে জড়ো হন নগরবাসী। সুরের সম্মোহনে বকুলতলায় ফাল্গুনের প্রথম প্রহরে মিলেমিশে একাকার প্রকৃতি আর মানুষ। বসন্তের এই বর্ণিল সাজরঙের ছটা ইট-পাথরের এই নগরবাসীর জীবনে ছড়িয়ে থাক বছরজুড়ে এমন প্রত্যাশা।

শুধু রাজধানীতে নয়, দেশজুড়ে বসন্তের আবাহনে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান। প্রকৃতি আর মানুষের এই মিলনমেলা গোটা দেশকে মাতিয়ে তোলে আনন্দ হিল্লোলে। ইথারে ইথারে তার রেশ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে। বসন্তের প্রথম সকালে বাসন্তীরঙা শাড়ি, কপালে টিপ, হাতে চুড়ি, পায়ে নূপুর, খোঁপায় গাঁদা ফুল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়বে তরুণী-বধূরা। বাসন্তী পাঞ্জাবি, কতুয়া-পরা হাজারো ছেলে-বুড়োর ঢল নামবে বসন্তবরণের নানা আয়োজনে। বসন্তের আগমনে কাঞ্চনের ঝিরিঝিরি হাওয়া, রক্তিম পলাশ, শিমুল, কাঞ্চন পারিজাত, মাধবী, গামারী আর মৃদু গাঁদার ছোট ছোট ফুলের বর্ণিল রূপে চোখ জুড়াবে। বসন্ত তারুণ্যেরই ঋতু, তাই সবারই মনে যেজে ওঠে, কবির এ বাণী- 'বসন্ত ছুঁয়েছে আমাকে। ঘুমন্ত মন তাই জেগেছে, পরলা ফাল্গুন আনন্দের দিনে'। বসন্ত উৎসব বাঙালির প্রাণের উৎসব। বর্ষবরণ, নবান্ন উৎসব, পৌষমেলা- এসবের মতো বসন্ত উৎসবও বাঙালি চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহমর্মিতা। দৃঢ়তর হয় মৈত্রীর বন্ধন।

বসন্তের আগমন ঘটে ফুলে-ফলে বর্ণিল প্রকৃতি নিয়ে। প্রকৃতির এই রূপ-লাবণ্য মানবমনেও যেন অন্যরকম দোলা দিয়ে যায়। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাংলা কিংবা অন্য ভাষার কবিতা, সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে বসন্তের রূপ, সৌন্দর্য এবং প্রভাব। বসন্ত ঋতুকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা, সাহিত্য এই ঋতুকে আরো মোহনীয় করে তুলেছে। মূলত, কাব্য, সাহিত্যে ঋতু বসন্তের রূপ-সৌষ্ঠব এতোটাই প্রাধান্য পেয়েছে যে কালক্রমে বসন্ত ঋতুর গৌরব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সর্বত্র। এরমধ্যে সংস্কৃত কবিরা যেমন আছেন, তেমনি বিলেতি কবিরা আছেন এবং আছেন বাঙালি কবিরাও। মূলত বসন্তকাল বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে যতটা বেশি স্থান দখল করে আছে অন্য কোনো ঋতু ততটা দখল করতে সক্ষম হয়নি। আর এই গৌরবই তাকে কালক্রমে ঋতুর রাজার আসনে অভিষিক্ত করেছে। পশ্চিমা বিশ্বে বসন্ত যেন প্রাণ ফিরিয়ে দেয় প্রকৃতিকে। শীতকালে তুষার আচ্ছাদিত বনানী-জনপদ, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া অবস্থা, বৃক্ষগুলোর নিস্পত্র, কঙ্কালসার অবস্থা হয়ে যাওয়ার পর বসন্ত আসে আশির্বাদের মতো। প্রাণ সঞ্চার হয় প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে। আর বাংলাদেশে বসন্ত আসে পাতাঝরা দিন, আর কিশলয় নিয়ে। আসে দখিনা বাতাসের ধূলি-ধূসরিত এক মধুময় আবেশ নিয়ে। যদিও চৈত্রের পতাঝরা নির্জন দিনগুলোও বেশ উপভোগ্য। বাংলার প্রকৃতি ও বাঙালি মনের খুব কাছের ঋতু বসন্তকাল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বঙ্গাব্দ ১৪০১ সাল থেকে প্রথম 'বসন্ত উৎসব' উদ্‌যাপন করার রীতি চালু হয়। সেই থেকে জাতীয় বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ বসন্ত উৎসব আয়োজন করে আসছে।

বসন্ত তারুণ্যেরই ঋতু। 'বাসন্ত বসন্ত। প্রাণ খুলে তাই যেন কবির ভাষায় বলা যায়, 'আহা আজি এ বসন্তে/ এতো ফুল ফোটে/এতো বাঁশি বাজে/ এতো পাখি গায়'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আধুনিককালের বাউল কবির মনকেও বারবার দুলিয়েছে ঋতুরাজ বসন্ত। বাঙালির জীবনে বসন্তের উপস্থিতি অনাদিকাল থেকেই। কবিতা, গান, নৃত্য আর চিত্রকলায় আছে বসন্তের বন্দনা। ষড়ঋতুর দেশে আবহমান গ্রামবাংলার প্রকৃতিতেই মূলত বসন্ত জানান দেয় তার আগমনী বার্তার। গ্রামের মেঠোপথ, নদীর পাড়, গাছ, মাঠভরা ফসলের ক্ষেত বসন্তের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। চোখ বুজলেও টের পাওয়া যায় এসব দৃশ্যপট। বসন্তের এই দিনে মুছে যাক, মুছে যাক সকলের মনের ক্ষত, ক্লেদ, মান-অভিমান। বসন্তের দোলা লাগুক সবার মনে-প্রাণে এটাই প্রত্যাশা। সবাইকে ঋতুরাজ বসন্তের অভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী: সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের নিরাপদ আশ্রয়

শাহনাজ সিদ্দীকি সোমা

এক সময় বিশ্ব মানচিত্রে দরিদ্রতম দেশ হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশের আজকের পরিচয় দক্ষিণ এশিয়ার 'ইমার্জিং টাইগার' বা উদীয়মান বাঘ। কিন্তু পূর্বে 'এশিয়ান টাইগারস' বা 'এশিয়ার বাঘ' বলতে সাধারণত হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকেই বুঝানো হতো। কিন্তু এখন এশিয়ার অর্থনীতিতে বাঘ হিসাবে বাংলাদেশও তার শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। কারণ এক দশক যাবত এশিয়ার যে কয়েকটি দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিজনেস ইনসাইডার-এর সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত There could be a new 'Asian Tiger'. Here's why- শীর্ষক এক নিবন্ধে এশিয়ার অর্থনীতির নতুন বাঘ হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে বিস্ময়কর উত্থান ও অগ্রযাত্রা এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আর এসবই সম্ভব হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' খ্যাত দশ প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে।

রূপকল্প-২১ সামনে রেখে এসব প্রকল্পের যে সফল বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিলো তা সম্পন্ন করতে পারলে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক রচিত হবে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, শিক্ষা সহায়তা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ। এগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়ন ও ট্র্যাকিং করার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা সমন্বয় করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর থেকেই মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। টানা তিন মেয়াদে সরকারের ক্ষমতায় থেকে তিনি দেশের অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। সরকারের তরফ থেকে এ লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পের কাজ, যা বদলে দেবে আগামীর বাংলাদেশের দৃশ্যপট ও অর্থনৈতিক গতিধারা। শুধু প্রকল্প গ্রহণই নয়, প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং তদারকি করছেন জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই ধারাবাহিকতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

গড়ে তুলতেও বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তাঁর সরকার।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হলো আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের সামাজিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ এটি এমন একটি নিরাপদ বেড়াজাল যার মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সংবিধানে (পঞ্চদশ সংশোধন ২০১১ অনুচ্ছেদ ১৫ (খ) মৌলিক প্রয়োজন ব্যবস্থা) সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।"

সংবিধানে ১৫(খ) ধারার বাধ্যবাধকতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু হয় খাদ্য ও নগদ অর্থ সাহায্য রিলিফ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে। সত্তর দশকে মূলত রিলিফ কাঠামোর মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আটকে ছিল। সত্তর দশকের শেষে সীমিত পরিসরে ও আশির দশকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, অর্থ প্রদানের সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে। এরপর নব্বই দশকের পুরোটাই ছিল ব্যাপক আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান ব্যবস্থা থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির সূচনা, যা এখনো বিদ্যমান। নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ কর্মসূচিগুলো দরিদ্র সাধারণের জন্য নেয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যসহায়তা (জিজিএফ), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতা বাড়ানো ও ক্ষুদ্র ঋণ।

নব্বই দশকের প্রথমদিকে খাদ্যে পল্লি-রেশন ব্যবস্থা ক্রমে বন্ধ করে দেয়া হয়। এ দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম সময়ে দুস্থ জনগোষ্ঠী যেন সরকারের সহায়তা পায়, সেজন্য কার্ড বা জিজিএফ কার্ড নামে পরিচিত, এক উদ্ভাবনী পন্থার প্রচলন করা হয়। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার সময় দেশব্যাপী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো দেশে সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম ও দুস্থ মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতার প্রচলন করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অতীত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে যুক্ত করে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে কতগুলো কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তায় যুক্ত হয়। এগুলো আগে নেয়া কর্মসূচিগুলোর ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত কর্মসূচি যেমন কর্মসংস্থানমূলক দুস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (আইজিডিপি), খাদ্যনিরাপত্তা ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (এফএসডিপি), অতিদরিদ্র চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি (টিইউপি), সরকারের যৌথ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুযোগ (রিইজিপিএ), আরইআরএমপিসহ আরো অনেক কর্মসূচি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং এনজিও দ্বারা বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। এসময়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে এনে সমাজে দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণে সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে যে দরিদ্র ও দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য নেয়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির চাহিদা, আওতা ও পরিধি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেড়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক জনবান্ধব সরকার দেশের আপামর মানুষের- বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠী, শিশু, মহিলা, শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য ২০০৮ সাল থেকে প্রতি বছর বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলেছেন।

অর্থ বিভাগের তথ্যানুযায়ী, দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতের আওতায় ১২৩টি কর্মসূচি যা বিস্তৃত রয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে ২৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এগুলোর মধ্যে ৮টি কর্মসূচি হচ্ছে নগদ ভাতা, আর ১১টি খাদ্য সহায়তা। দিন দিন ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এখাতে প্রতি বছর সরকারের ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের চার বছরের নিচের শিশুদের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া শিশুরা একই সঙ্গে অন্যান্য সুবিধা- প্রতিবন্ধী সুবিধা, বিদ্যালয়ে খাদ্য সুবিধা, এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং আইনি সুরক্ষা পাওয়ার জন্য যোগ্য হবে। যাতে পরিত্যক্ত শিশুরা দায়িত্বপূর্ণ অভিভাবকদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়। ২০২৩ থেকে সারা দেশে সব সরকারি বিদ্যালয়ে শিশুদের দুপুরের খাবার দেয়া সরকারি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তরুণদের শিক্ষা সমাপ্ত ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে অনুধাবিত করার জন্য শিক্ষা ও সক্ষমতাবিষয়ক কর্মসূচিগুলোকে শক্তিশালী করার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ন্যাশনাল সার্ভিস ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আছে ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের- বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, দুস্থ, একক মাতা এবং বেকার একক নারীর- জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করার কর্মসূচি যা শুধু পারিবারিকভাবে নয়, সামাজিকভাবেও নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সব প্রতিবন্ধী শিশুদের 'শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা' প্রদান করা ছাড়াও ১৯-৫৯ বছর বয়সী তীব্র প্রতিবন্ধিত্বের শিকার সব প্রান্তবয়স্ককে প্রতিবন্ধী সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কর্মসূচিকে দীর্ঘ টানা তিন মেয়াদের সরকারের সময় বাড়ানো হয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা, জিজিডির আওতায় ভাতাভোগীদের সংখ্যা, বিধবা, স্বামী নিগৃহীত, দুস্থ মহিলাদের ভাতা বাড়িয়ে ভাতাভোগীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের সব পৌরসভার কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দরিদ্র মাকে এ ভাতার আওতায় আনা

হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে বয়স্ক ভাতার পরিধি এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা। ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিকে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বেদে, চা-শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও ভাতা প্রদানের কর্মসূচি আছে যা দিন দিন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের ডাটাবেজ হালনাগাদ করছে। শহিদ পরিবার ও যুদ্ধাহতসহ সব মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্নীতি এড়াতে এবং প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব সামাজিক ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রেরণ করারও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সময় অপচয় কম হচ্ছে এবং দুর্নীতিমুক্ত ভাতা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

ই-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার বার আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি দু'বার সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০১১ ও ২০১৩ সালে তাঁকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ইউএন উইমেন ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' পুরস্কার ও 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' প্রদান করে।

টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১৯ সালে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)। প্রধানমন্ত্রীকে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট এ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করে ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ও উদ্যোক্তা তৈরিতে অসামান্য নেতৃত্বদানের জন্য শেখ হাসিনা গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ এওয়ার্ড লাভ করেছেন। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্লোবাল সামিট অব ওমেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রধানমন্ত্রীকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত হয়ে আসা ১০ লাখের মতো রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছেন মানবতাকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অসহায় এই মানুষগুলোর প্রতি মানবতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি মাদার অব হিউম্যানিটি (মানবতার মা) উপাধিতেও ভূষিত হন।

শেখ হাসিনার উন্নয়ন পরিকল্পনা আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক। একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত বছরে সেটা হাতে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে দেশ আজ একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক দেশে পরিণত হয়েছে। এসব করতে গিয়ে শেখ হাসিনাকে অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হয়েছে।

সম্প্রতি কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সরকার তার যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক উন্নত দেশ যখন মহামারীটির বিপর্যয় মোকাবেলায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ সরকার মহামারী মোকাবেলায় এবং অর্থনীতির গতিপথকে ঠিক রাখতে অসাধারণ কাজ করেছে। ১২০,০০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের সরকারের সাহসী সিদ্ধান্ত সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। এই প্রণোদনা প্যাকেজটি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বড় একটি প্যাকেজ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের পাশাপাশি, শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সময়ে সরকার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে সহায়তা দিয়েছে। এসময় সরকার সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর কর্মসূচির আওতা আরও বাড়িয়েছে এবং উন্মুক্ত বাজারের মাধ্যমে কম দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করেছে।

গত এক দশক ধরে শেখ হাসিনার বিশ্বাসযোগ্য ও বুদ্ধিমান নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যতিক্রমীভাবে দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছে। ফলস্বরূপ, বিভিন্ন খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাকি মেয়াদে সরকারের উচিত শাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে উন্নতির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তবে এক্ষেত্রে সরকারের একার পক্ষে সকল বিষয়ে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি জনগণের দায়িত্ব হলো দেশের উন্নতির জন্য সরকারকে সহায়তা করা। গত এক দশকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করছে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে আমাদের সকলের উচিত সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে আন্তরিক সমর্থন করা।

দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর এবং এসডিজি অর্জনে এসব খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘে ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) মূল ভাবনার সঙ্গে সরকারের সর্বজনীন মানব উন্নয়ন চিন্তার ব্যাপক মিল রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন ভাবনা কার্যকরভাবে উপস্থাপন করে সকল কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

কাউকে পিছনে ফেলে নয়, সকলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দর্শনটি আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির অভিযাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল হিসেবে সমাদৃত, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে সবপক্ষের বিকশিত করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথকে সুগম করেছে। সকল সমস্যা মোকাবেলা করে ২০৩০ সালে এসডিজি এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠন করাই এখন সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

বেল্ট

রহমান তৌহিদ

সবেমাত্র কড়া কফিটা শেষ করেছেন মফিজ, এমন সময় দপ্তরকক্ষে ঢুকলেন 'নাছোড়বান্দা ভাইজান'খ্যাত সহকর্মী। কফির তিক্ততা কমানোর জন্য সদ্য কিনে আনা কফিমেট মিশিয়েছিলেন। সহকর্মীকে দেখে মনটা তেতো হয়ে গেল। মিউজাবী কর্মকর্তা হিসেবে মফিজের সুনাম আছে। এমন নয় যে তিনি কাউকে কিছু খাওয়ান না, তবুও নাছোড়বান্দা ভাইজানকে এখন কফিমেটসহ কফি খাওয়াতে হবে মনে করেই মনটা তেতো হয়ে গেল।

'এই পানি গরম দাও, চিনি হবে না। ও কফিমেটও দেখছি। মনটা ভালো হয়ে গেল। অফিসে এসব রাখতে ফলিজা লাগে। আপনার আছে।'

বাক্যের প্রথম অংশ মফিজের অফিস সহায়ককে উদ্দেশ্য করে বলা। আর দ্বিতীয় অংশ মফিজকে।

বিস্কুট কফিতে ডুবাতে ডুবাতে ভাইজান বললেন, 'কফির মধ্যে বিস্কুট এমনভাবে ডোবাবেন না যে সেটা বিনয়ে গলে যায়। হা হা হা। আমাদের বড় বস হয়েছেন সেই বিস্কুটের মতো। মাননীয় যে খায়েস প্রকাশ করছেন, উনি তা বাস্তবায়ন করছেন। এদিকে তার প্যান্টের হুক ঢিলা হয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। বার বার হাত দিয়ে তুলে ঠিক রাখছেন।'

সতর্কতার সাথে মফিজ বলে, 'তা বেল্ট পরলেই পারেন।'

'উহু, সেটি হবে না। কোন এক কালে বড় বসের এক বস ছিলেন, যিনি প্যান্টে বেল্ট পরতেন না। সৎ অফিসার হিসেবে তার প্রভূত সুনাম ছিল। তিনি দর্জিকে বলতেন, 'প্যান্ট যদি বেল্ট দিয়ে পরতে হয় তো তোমার কাছ থেকে বানাবো কেন? সারাজীবন বড় ভাইয়ের পুরোনো ঢিলা প্যান্ট পরেছি বেল্ট লাগিয়ে। এখন নতুন প্যান্টও বেল্ট দিয়ে পরতে হবে?' তো বসের এই আদর্শ আমাদের বড় বস মেনে চলেছেন। তিনিও প্যান্টে বেল্ট পরেন না।'

মফিজ দাঁত কিড়মিড় করলেন। মনে মনে বললেন, 'শালা হারামজাদা, আমি একটা বেফাঁস কথা বলি আর তা দিয়ে বড় বসকে লাগাও। সে সুযোগ তোমাকে দেবো না। কফিমেটের উপর দিয়ে যাক।' আর প্রকাশ্যে দাঁত কেলিয়ে বললেন, 'তা যা বলেছেন, ভাই। আমাদের বস নিপাট একজন ভদ্রলোক ও সৎ অফিসার। প্যান্ট পরতে তার বেল্ট লাগে না। আর ভদ্রলোকের প্যান্টে বেল্ট থাকে না। হা হা হা।'

ভাবটা এমন যেন, জটিল কোন জ্ঞান বিতরণ করেছেন।

সততার সাথে বেল্টের কী সম্পর্ক তা নির্ণয় করার জন্য সামাজিক গবেষণা করা যেতে

পারে। পরিসংখ্যানের সূত্র দিয়ে দেখা যেতে পারে।

তা যা বলছিলাম, বেল্ট। মফিজের ভুলজীবনে বেল্টের বালাই ছিল না। সাদা শার্ট আর বেল্টি ব্লু প্যান্ট পরে কাটিয়ে দিল সময়। কলেজে উঠে রেডিমেড জিন্সের প্যান্ট পরার পর মনে হলো বেল্ট পরা প্রয়োজন, কোমর থেকে প্রায়ই প্যান্ট নেমে যাচ্ছে। বেল্ট কিনতে গিয়ে দেখে সেখানে মহাঝামেলা। চামড়ার বেল্ট, রেক্সিনের বেল্ট, কাপড়ের বেল্ট। তার আবার বাহারি ডিজাইন। জিন্সের প্যান্টের সাথে পরতে গেলে একটু উল্টাপাল্টা ডিজাইন পরতে হয়।

পরবর্তীকালে চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে যাবার আগে মফিজ অত্রজনোচিত প্যান্ট শার্ট বানালো ও পাশাপাশি চামড়ার বেল্ট কিনলো। আর কেনার আগে দোকানিকে বললো, 'চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি। বোঝেনই তো, ভদ্র বেল্ট দেখান।' সেই থেকে মফিজের সংগ্রহে দুই ধরনের বেল্ট আছে- ভদ্র বেল্ট আর অভদ্র বেল্ট। ভদ্র বেল্ট পরে ভদ্র প্যান্টের সাথে আর অভদ্র বেল্ট পরে জিন্সের পান্টের সাথে।

দেশের এক নামকরা অর্থনীতিবিদকে দেখে কাঁধ থেকে ঝুলানো বেল্ট পরার শখ হয়েছিল মফিজের। পরে দেখলো ইংরেজদের ঐতিহ্য ঐ কাঁধ থেকে ঝুলানো বেল্ট পরার জন্য মানানসই ভুরি তার নেই আর এটা বানানোর কোন ইচ্ছাও তার নেই। ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল মফিজ কিন্তু মনে করিয়ে দিল সহকর্মী তাপস বোস। এক বছর ইংল্যান্ডে পড়াশুনা শেষে সে বিদ্যাবুদ্ধির সাথে যেটা নিয়ে এল তা হলো এই কাঁধ থেকে ঝুলানো বেল্ট।

কুকুরের গলায় বেল্ট লাগানো হয়। সেটার মূল্য মালিকের সামর্থ্যভেদে কয়েক টাকা থেকে কয়েক লক্ষও হতে পারে। তবে মূল্য যাই হোক, তাকে বলে ডগ বেল্ট।

বাংলাদেশের মেয়েরা আগে শাড়ি বা ছালোয়ার কামিজ পরতো, তাই সেখানে বেল্ট বাঁধার বাকি ছিল না। জিন্সের প্যান্ট চলে আসাতে টিকন লেডিস বেল্ট এখন বহুল প্রচলিত। এছাড়া বেলি বেল্ট থেকে রিস্ট বেল্ট ইত্যাকার বেল্ট এখন মেয়েদের বেল্ট পরার শখ মেটাচ্ছে। আর ঘড়ির বেল্ট নিয়ে তো পছন্দের শেষ নেই। মেয়েদের ঘড়ির বেল্ট ও ডায়াল দেখতে হয়, সেখানে ক'টা বাজে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ বয়সের মতো মেয়েদের ঘড়ির কাঁটাও থমকে থাকে।

তো, এয়ারপোর্টে কনভেয়ার বেল্টের সামনে দাঁড়িয়ে এতদিন লাগেজের অপেক্ষায় থাকা বিরক্তিকর ছিল, এখন যোগ হয়েছে সিকিউরিটি চেকইনে বেল্ট খোলা। সত্য মিথ্যা জানি না, এক বন্ধু বলেছিল, শাহরুখ খানের যখন অহংকার বেড়ে যায়, তখন তিনি আমেরিকায় যান। কারণ, আমেরিকার এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি তার প্যান্টের বেল্ট খুলিয়ে ছাড়ে।

মফিজ নিজেকে হোমড়া-চোমড়া না ভাবলেও ভদ্রলোক ভাবে। তাই এয়ারপোর্টে প্রথমবার যখন বেল্ট খুলতে বললো তখন নিতান্ত অপমানিতবোধ করলো। সবাই খুলছে, তাই তিনিও খুললেন। বেল্টের মধ্য দিয়ে মানুষ কি পাচার করে সেটা জানার খুব ইচ্ছা ছিল মফিজের। সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেন, বেল্টের মধ্যে নাকি বিশেষ কায়দায় সোনা চোরাচালান হতো।

বেল্ট খোলার ব্যাপারটা যে মফিজের কাছে অস্বস্তিকর তা বুঝতে পেরেছেন তার সহকর্মী। তাই একবার সাপ্তাহিক কাজে কক্সবাজার যাওয়ার পর সহকর্মী বললেন, 'স্যার এবার ফেরার পথে আপনি যদি বেল্ট না খুলে সিকিউরিটি চেক পার হতে পারেন তো আপনাকে কোক খাওয়াবো।'

'কোক খাওয়াবো? মানে কি?'

'না, মানে স্যার, আপনি তো অন্য কিছু পছন্দ করে খান না, এই একটা জিনিসই খান, তাছাড়া কমের উপর দিয়ে বাজি ধরলাম আর কি।'

'বাজিল তো ভালই হয়েছে। বুঝেছি সন্দেহ। তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।'

এবার মফিজ এয়ারপোর্ট সিকিউরিটিতে ঢোকার আগে হাতে ফাইলটা নিলেন যাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ডনতঃ কক্সবাজার' আর কানে মোবাইল ফোন লাগিয়ে কথা বলতে বলতে ব্যাকপ্যাকটা নিতান্ত বিরক্তির সাথে স্ক্যানার মেশিনে ঢুকিয়ে দিলেন। দ্রুতপদক্ষেপে হেঁটে গেলেন, কিসের বেল্ট খোলা। সিকিউরিটির লোকজনদের দিকে মৃদু হেসে বললেন, 'সব ভাল'। এটা প্রশ্নও হতে পারে আবার শুভেচ্ছাও হতে পারে।

মফিজের বেল্টের মধ্যে কিছুই ছিল না, তিনি বেল্টটি স্ক্যানার মেশিনের মধ্য দিয়ে পার করালে কিছুই পাওয়া যেত না, তবু তিনি এটা করলেন।

এই গল্প তিনি অনেকবার বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, নিয়ম ভাঙার মজা পেতে তিনি এটা করেছেন। অন্য একটা গ্রুপ বলেছে, তিনি বাজিতে কোক জেতার জন্য এটা করেছেন।

বেল্ট সংক্রান্ত লেখা শেষ করার আগে যে গল্প না বললে হয় না, সেটা হলঃ

মোজাফফর সাহেব পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন। চাকুরি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং এ প্যারিস যাওয়ার সুযোগ হলো। এক সহকর্মী বললো, 'ভাই মোজাফফর, প্যারিসে এ সময় খুব ঠান্ডা তোমার এই পাজামা-পাঞ্জাবি চলবে না। প্যান্ট, শার্ট, ওভারকোট লাগাও।' ওভারকোট শার্ট তার সহ্য হলো কিন্তু রেডিমেড প্যান্ট নিয়ে বাঁধলো গোল। প্রায়ই কোমর থেকে পড়ে যায়। তাই টাইট দেখে বেল্ট কিনলেন। কি এক টেকনোলজির বেল্ট দোকানদার তাকে গছিয়ে দিল, যা পুশ করলে বেল্ট ঠুস করে খুলে যায়। আবার ঠাস করে লেগে যায়। যাহোক মোজাফফর সাহেব তো বেল্ট পুশ আর ঠাস করে বেশ পুলকিত। দুবাই এয়ারপোর্টে ট্রান্সজিটের সিকিউরিটি চেকে তাকে বেল্ট খুলতে বললো। পুশ আর হয় না, বেল্টও খোলে না। অনেক চেষ্টা করেও তিনি বেল্ট খুলতে ব্যর্থ হলেন।

এবার সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা ভদ্রমহিলার সন্দেহ বেড়ে গেল। তাকে এক পাশে নিয়ে বললো, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?

মোজাফফর সাহেব মহিলাকে কিভাবে বলে, তিনি বেল্ট খুলতে পারছেন না?

ভদ্রমহিলাকে প্যান্টের বেল্ট খুলতে সাহায্য করতে বলার মতো অভদ্র আমাদের মোজাফফর সাহেব নন।

লেখক রুম লেখক

একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সৈয়দা তাসলিমা আক্তার

শুধু বাঙালি নয় বোধ করি তাবৎ দুনিয়ার অধিকাংশ ভ্রমণপিয়াসী মানুষের কাছে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে আবার পাহাড় আর সমুদ্র- এই দুইয়ের মধ্যে কারো কারো কাছে পাহাড় প্রিয়, কারও বা সমুদ্র, আরেক শ্রেণি আছে যারা কিনা আজীবন এই ভেবে কাটিয়ে দেয় আসলে তাদের কাছে কোনটা প্রিয়। এছাড়া অন্য এক শ্রেণি আছে যাদের ঝোঁক ইতিহাস আর স্থাপত্যের দিকে আমি বাবা সেই দলের নই। তাই আর সেদিকে না যাই, আর যারা শুধু শপিং এর উদ্দেশ্যে এদিক-সেদিক, এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা নাই বলি। ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমি একান্তই হা-পোষা, কম খরচে ধারে বা দূরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ পেলেই কর্তে যাই। তাই বলে নিজের পছন্দ বা ভালো লাগার কথা বলতে তো মানা নেই, আমি বলি বেশ জোরেসোরেই বলি। সমুদ্র আমার কাছে আজীবন প্রথম প্রেম হয়েই রইল, আজ অবধি এর থেকে মুক্তি ঘটেনি। এর আগে প্রথম সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলাম, সে এক জটিল অনুভূতি। এবার লিখব অন্য একজনের প্রথম সমুদ্র দর্শনের ব্যাকুলতার কথা, সাথে নিজের কথা তো রইলোই।

২০০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাওয়ার এক সুযোগ এলো, আমি বলি সুবর্ণ সুযোগ। অবশ্য এর মধ্যে বেশ কয়েকবার সমুদ্র দর্শনের সুযোগ হয়েছিল কিন্তু সেন্টমার্টিনে এই দ্বিতীয়বারের মতো যাবার পরিকল্পনা হলো। মূল বিষয়ে আসি। আমার বোন তার দুই বন্ধু এই পরিকল্পনার প্রণেতা, আমাকে তারা তাদের দলভুক্ত করল, পাশাপাশি এও জানালো আমি চাইলে আমার এক বা একাধিক বন্ধুকে দলভুক্ত করতেই পারি। ব্যাস আর কী চাই, মাধুরী আর আমি প্রায়ই সমুদ্র দর্শনে বেরিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেও অনেকটা সাহস আর অভিজ্ঞতার অভাবে শেষমেশ পিছিয়ে আসি। এবার আর আমাদের পায় কে? ওহ্ যারা আমাকে সাম্প্রতিক চেনেন তারা অবশ্য সাহসের অভাব কথাটা শুনে ভ্রূ কুঁচকালেও কুঁচকাতে পারেন, তবে মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু প্রায় বার বছর আগের কথা বলছি। সে যাই হোক আবার মূল কাহিনীতে ফিরে আসি। স্মৃতিশক্তি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে থাকে তাহলে নিশ্চিত আমরা ফেব্রুয়ারির আঠার তারিখ বিকেলবেলা যাত্রা শুরু করেছিলাম। যে কোনো যায়গায় ঘুরতে যাওয়ার আগে আমার প্রস্তুতি মোটেও কম থাকে না। এমন অনেক জিনিস তখন crying needs হয়ে দাঁড়ায় যার কথা অন্য সময় মনেও পড়ে না। অবশ্য সময়ের সাথে এ ফাজলামি থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসতে পেরেছি, maturity বলে কথা। তবে এ যাত্রায় আমি একদম পানিভাত হয়ে গেলাম মাধুরীর প্রস্তুতি আর উৎসুক্যতা দেখে। হবেই না বা কেন সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তার তখনও পর্যন্ত শূন্য, এর আগে একবার চট্টগ্রাম যাওয়ার সুযোগ বেচারির হয়েছিল, তবে তখন সমুদ্র দর্শনতো দূর গর্জন শোনার সৌভাগ্যও হয়নি, আর এককথায় সেন্টমার্টিন যাওয়া যা কিনা সমুদ্রের কোলে আরাম করে শোল খাচ্ছে, excitement তো থাকবেই। তবে বাড়াবাড়িটা এমন ছিল যে সর্বক্ষণই সে এই আশঙ্কায় থাকতো এই বুঝি যাওয়া বাতিল। আমি হয়তো এমনি তাকে ফোন করলাম অথবা প্রয়োজনেই করলাম তখনই তার হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠতো, বুঝি আমি এ কথা জানানোর জন্য ফোন করলাম-অনিবার্য কারণবশত যাত্রা বাতিল। তখন ব্যাপারটা এমন অবস্থায় গিয়ে ঠেকলো আমারই ভয় করতো তাকে ফোন করতে, না জানি তার হার্টের কি দশা হয়। সব ঠিকঠাক মতো এগোল। আমাদের যাত্রার সময়ও নির্ধারিত ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টা। তবে অনিবার্য একটা কারণ ঘটল, যা আমাদের যাত্রার সময় তিন ঘণ্টা পিছিয়ে দিল- যারা যারা আমরা সেন্টমার্টিন যাবো বলে জোট হয়েছি তাদের মধ্যে কোনো একজন অফিসের কাজে একটু ফেঁসে যাওয়ায় এই তিনটা ঘণ্টা অলে গেল। অগত্যা মাধুরীকে তো আমার ফোন করে এই খবরটা দিতে হলো, তা নাহলে সে হয়তো বাক্স-প্যাটরা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে ফোন করলাম, আমি কিছু বলার আগে তার সেই ভাষা রেকর্ড বেজে উঠল যাওয়া ক্যান্সেল তাইতো...

সন্ধ্যে ছয়টা কি সাড়ে ছয়টার দিকে আমরা রওনা হলাম পাঁচ সদস্যের ছোট্টদল, বাহনও ছোট টোয়োটা করোলা। যেহেতু আমাদের মধ্যেই একজন চালকের দায়িত্বে ছিল তাই ছোট বাহনেও খুব একটা সমস্যা হয়নি। সমস্যা হলো একেতো বৃহস্পতিবার তার সাথে লাগোয়া আবার ২১শে ফেব্রুয়ারির ছুটি, তাই বোধহয় শহরের অর্ধেক জনগণ শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। আর হলোও তাই যা হবার ছিলো; ঢাকা থেকে বের হতেই তিনটি ঘণ্টা অপচয়। মনে পড়ে রাত্রি তিনটায় আমরা চিটাগাং শহরে পৌঁছুলাম এবং সেখানে সামান্যিক যাত্রাবিরতি। না কোনো হোটেল বা মোটেলে না আক্ষরিক অর্থেই পথে অবস্থান। উদ্দেশ্য যিনি চালক তাকে কিছুটা সময় বিশ্রাম দেওয়া। আর আমাদেরই বা বাকি কব কী, টানা নয় ঘণ্টা পথে ছোটখাট চা-পানের বিরতি ছাড়া এই ছোট গাড়িটার মধ্যে মুড়ি হয়ে থাকা কম ক্লেশের বিষয় না কিন্তু। তাই এই ফুরসতে আমরা একটু হাত-পায়ের খিল ছাড়ানোর জন্য বেরিয়ে এলাম। চট্টগ্রামের মানুষের অদ্ভুত জীবনধারার কিছু গল্প অল্প-স্বল্প আগেই শুনেছিলাম। এই যেমন ঈদের শপিং তারা চাঁদ রাতেই করবে আর রাত ভোর করে শপিং শেষে বাড়ি ফিরবে। যেখানে অধিকাংশ বাঙালি ঈদের রান্নাবান্না কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে চেষ্টা করে একটু আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়তে বেশ ঈদের দিনের ধকলটা ভালোভাবে সামলাতে পারে। নিশ্চয় ভাবছেন হঠাৎ চট্টগ্রামবাসীর চরিত্র বিশ্লেষণ করছি কেন, বলছি তখন রাত ৩টা অতিক্রান্ত আমরা নির্জন রাস্তার একটু মানুষের আনাগোনা রয়েছে এমন একটি জায়গা খুঁজছিলাম। পেয়েও গেলাম রীতিমতো বিয়ে বাড়ির সন্ধান। এখানকার বিয়ে বাড়ি আর কি, মানে কমিউনিটি সেন্টার। ভ্রূ কুঁচকে ভাবছেন এ আবার এমন কি। ভাবতেই পারেন, তবে আমি অবাক হলাম এই দেখে তখন কনে বিদায় পর্ব যাচ্ছে। পরে জানলাম এটা এনিকবার খুব স্বাভাবিক আচার।

৪টা বাজার কিছু পরে আমরা আবার যাত্রা করলাম। ঢাকা শহর থেকে শীতের কুয়াশা তখন বিদায় নিয়ে বোধ করি চিটাগাং হয়ে কক্সবাজারের পথে রওনা দিয়েছে, আর পথে আমরাও তাদের সাথি হলাম অথবা তারা আমাদের। ব্যাপারটা যেদিক দিয়েই ভাবি না কেনো-কোনোটাই সুবিধাজনক হলো না। কুয়াশার দাপটে আমাদের যে পথচলা দায়

হয়ে পড়ল, চারিদিকে শুধু কুয়াশার সাদা চাদর, ডান-বাম বা উত্তর-দক্ষিণ তখন সব এক। হাইওয়েতে কোনোভাবে গাড়ি সাইডে পার্ক করাও সম্ভব না, পথটা চলতেই হবে, চলছিও; অনেকটা না পুরোটাই অন্ধের মতো। এই করে কিছুদূর চলার পর ঢাকা টু কক্সবাজারগামী এক বাসের পিছু ধরলাম এবং বাকি পথটা এই করেই কক্সবাজার পৌঁছুলাম। ঠিক কয়টার কক্সবাজার পৌঁছুলাম মনে নেই, হাতে সময় খুব কম, আমরা হোটেলে পৌঁছে চোখে-মুখে পানি দিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের টেকনাফ থেকে সি-ট্রাক ধরতে হবে, সুতরাং সকাল ৯টার অবশ্যই ঘাটে পৌঁছুতে হবে।

বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই টেকনাফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারব কি না, না শেষপর্যন্ত কেমন কোন বিপর্যয় ঘটেনি। হাতে কিছু সময় থাকতেই আমরা টেকনাফ পৌঁছে গেলাম। সি-ট্রাকের টিকেট সংগ্রহসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে একটু ফুরসত মিলল, সময়টা আমরা কাছে লাগালাম ভুরিভোজনে, অর্থাৎ নাস্তাটা সেরে নিলাম। সাড়ে নয়টার দিকে আমরা সি-ট্রাকে উঠে পড়লাম। কেন এটার নাম সি-ট্রাক এই প্রশ্নটা তখন থেকেই আমাকে খোঁচাচ্ছে। কোন সন্তোষজনক জবাবও খুঁজে পেলাম না। আসলে নামটা শুনে হয়তো অনেকেরই মন ক্ষিপ্রগামী কোন যানের কথা ভেবেছিল, আসলে এটি একটি ছোটখাট সামুদ্রিক জাহাজ। যাই হোক, দোতলার খোলা ডেকে আমরা অবস্থান নিলাম, সি-ট্রাক চলতে শুরু করা মাত্রই বেশ কোমল সমুদ্র আমাদের তার গর্জন দিয়ে স্বাগত জানাল। যদিও তখনও পর্যন্ত আমরা নাফ নদী অতিক্রম করছিলাম।

টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যেতে সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা দুই। মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষে জাহাজ এগিয়ে চলছে, জাহাজের স্পিকারে বেজে চলছে পথের বর্ণনা ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের ইতিহাসের আদ্যপান্ত। তবে খুব কমযাত্রীরই সেদিকে মনোযোগ রয়েছে, অধিকাংশ যাত্রী জাহাজের রেলিং ধরে সমুদ্র আর সিগালের খেলা দেখতেই ব্যস্ত, আর এই ব্যস্ততায় দু'ঘণ্টা যেন নিমিষেই ফুরিয়ে গেল। জাহাজ থেকে নেমে হোটেলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা প্রায় বারোটা। এটাকে ঠিক হোটেল বলা যায় কিনা , আমার মনে হলো তিন কামরার একটি টিনের ঘর সামনে টানা বারান্দা, জানলাম এতলোকে রিসোর্ট বলে, চুপি চুপি বলে রাখি এর আগে আমার রিসোর্ট সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলো না। সে যে নামেই ডাকা হোক না কেনো থাকার জায়গাটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। পছন্দের আরেকটা কারণ হলো অবশ্য এরপাশেই ছিলো সমুদ্র বিলাস, কি নামটা চেনা-চেনা লাগে। ঠিক তাই হুমায়ুন আহমেদের সমুদ্র বিলাস। খাওয়ার আয়োজনও রিসোর্টে ছিলো, তাই সকলে ফ্রেশ হয়ে চটজলদি খেতে বসে গেলাম। কেউ কেউ বিকেলে বিশ্রামের আয়োজন করলেও আমি আর মাধুরী সমুদ্র দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। আর বাকি দুটো দিন আমাদের সকল কর্মযজ্ঞ এই সমুদ্রকে ঘিরেই ছিলো, পরিচয় ঘটেছিল কিছু চেনা, কিছু অচেনা চরিত্রের সঙ্গে, খুঁজে ফিরেছি প্রকৃতির গভীর সৌন্দর্য। সুনীল আকাশ আর কিছুটা সবুজাভ সমুদ্র আমাদের সময়ের হিসেব গুলিয়ে দেয়। কিন্তু আজ আর সে গল্পে যাবো না, অন্য কোনো দিন অন্য কোনো আয়োজনের জন্য তোলা থাক সে গল্প।

লেখক: উপপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

অমর একুশে

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

ছবি: আসরফিল হোসেন
আশাজনি, সাতক্ষীরা

ক্যাপির গল্প

আসিফ মেহ্‌দী

চাঁদের চরকাকাটা বুড়ির গল্প তোমাদের জানা কিন্তু ইংল্যান্ডের লিভারপুল শহরের বুড়ির গল্প কারোও জানা নেই। নাম তার সোফিয়া। সোফিয়ার পরিবার- আত্মীয়-স্বজন বলতে পৃথিবীতে কেউ নেই। থাকেন প্রাচীরঘেরা বাগানওয়ালা সুন্দর একটি বাড়িতে। সারাদিন ঘরে বসে তোমাদের জন্য রূপকথা লেখেন। তার রূপকথায় দৈত্য পছন্দ করে টক দই, ভূত পছন্দ করে পিনাট-বাটার আর পেত্নি পছন্দ করে পপকর্ন। পড়ালেখার ফাঁকে সময় পেলে সোফিয়ার লেখা রূপকথা পড়ো।

এবার আসল ঘটনায় আসি। সোফিয়ার ছিল স্যাব্রাডর প্রজাতির কালো রঙের বিশালদেহী একটি কুকুর। বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত প্রাণি বলে পরিচিত কুকুর তার মনিবের জন্য সাধ্য অনুযায়ী সবরকম কাজ করে। এমনকি প্রয়োজনে মনিবকে বাঁচাতে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। সোফিয়ার কুকুরটির নাম ক্যাপি। 'ক্যাপ্টেন'কে সংক্ষেপে বলে 'ক্যাপি'।

সোফিয়ার লেখার টেবিলের কাছে বসে থাকে ক্যাপি। বয়সের কারণে সোফিয়ার হাঁটতে সমস্যা হয় বলে ক্যাপি তার বাজার-সদাই করে দেয়। বাজারের লিস্ট লিখে ক্যাপির মুখে দিলে সে দৌড়ে চলে যায় কাছের একটি দোকানে। দোকানদার বুঝতে পারেন রূপকথার লেখক সোফিয়ার বাজার প্রয়োজন। মুখ থেকে লিস্ট নিয়ে সেই অনুযায়ী বাজার ব্যাগে ভরে দিয়ে দেন ক্যাপির মুখে। বাজার চলে আসে সোফিয়ার ঘরে। তারপর ব্যাংক কার্ড দিয়ে দেন সোফিয়া। সেটি নিয়ে আরেকবার দৌড় দেয় ক্যাপি। দোকানদার কার্ডের মাধ্যমে দাম রেখে দেন।

পৃথিবীর সব জায়গায় দুষ্টু লোক আছে। সোফিয়া বাসায় একা থাকেন এবং তার ঘরে অনেক দামী জিনিসপত্র, এসব তথ্য জেনে গেল একদল দুষ্টু চোর। দুষ্টের দল কয়েকবার বাসায় ঢোকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ক্যাপির কারণে। তারা ঢোকার চেষ্টা করলেই ক্যাপি ভয়ঙ্কর বিকট চিৎকার। চোর তাড়িয়ে সোফিয়ার লেখালেখির টেবিলের পাশে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ক্যাপি। ক্যাপি কথা বলতে না পারায় চোরের কথা জানতে পারে না সোফিয়া।

একদিন চোরেরা খারাপ বুদ্ধি আঁটল। ক্যাপির জন্য বাসার একপাশে মজার খাবার রেখে গেল। সঙ্গে মিশিয়ে দিল বিষ! অচেনা খাবার এভাবে খাওয়া উচিত না, এটা ক্যাপির জানা নেই। ক্যাপি মজা করে খেল। ব্যস, তার শরীরে শুরু হয়ে গেল বিষক্রিয়া। কোনোভাবে হেলেদুলে ক্যাপি হাজির হলো সোফিয়ার ঘরে। ক্যাপির এই অবস্থা দেখে সোফিয়া সাহায্যের জন্য ইমার্জেন্সি নম্বরে কল দিলেন। ক্যাপিকে নেওয়া হলো হাসপাতালে। সেখানে তার বিষ নামানো হলো ঠিকই; তবে কুকুরটির পেছনের দুই পা অবশ হয়ে গেল।

এরপর থেকে ক্যাপি সামনের দুই পা দিয়ে কষ্ট করে এগোয়। বিষের প্রভাবে একসময় ক্যাপির পায়ের সমস্ত লোম পড়ে গেল। পেছনের অবশ দুই পা টেনে হাঁটতে ক্যাপির খুব কষ্ট হয়। তারপরও সোফিয়ার জন্য তার কি মায়া! জীবন কষ্ট করে দোকান থেকে বাজার নিয়ে আসে। কাজ শেষে ক্লান্ত হয়ে বসে থাকে সোফিয়ার লেখার টেবিলের পাশে। সোফিয়া দোকান থেকে ক্যাপির জন্যও মজার মজার খাবার কেনেন। ক্যাপি সেগুলো সোফিয়ার পাশে বসেই খায়।

এক সকালে সোফিয়া লক্ষ্য করলেন, ক্যাপির মন খুব খারাপ। তাই তাকে আর বাজারে পাঠালেন না। কিন্তু বিকেলের দিকে ক্যাপি বাড়ির সামনের রাস্তা পার হয়ে অপর পাশের মাঠে চলে গেল। ক্যাপিকে বাজার নিতে না দেখে দিনশেষে দোকানদার সোফিয়ার বাসায় হাজির হলেন। সোফিয়া জানালেন, ক্যাপিকে খুঁজে পাচ্ছেন না। ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পরও সূর্যের আলো থাকে। সেই আলোয় দোকানদার ক্যাপিকে খুঁজতে খুঁজতে অপর পাশের মাঠে গেলেন। তার সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠে হাজির হলেন সোফিয়া। ডাকতে লাগলেন 'ক্যাপি' বলে।

হঠাৎ সোফিয়া দেখতে পেলেন, ক্যাপির নিস্তেজ দেহ পড়ে আছে মাঠে! ক্যাপির মৃতদেহ দেখে সোফিয়া চিৎকার করে কান্না শুরু করলেন। আশপাশের বাড়িঘর থেকে মানুষ ছুটে এল। এত মানুষ আশপাশে ছিল, এতদিন জানা ছিল না সোফিয়ার। কারণ, কেউ কখনো পাশে ছিল না; শুধু ক্যাপি সকলময় ছিল তার পাশে। হয়তো ক্যাপি বুঝতে পেরেছিল তার মৃত্যু আসন্ন। সোফিয়া যাতে কষ্ট না পায়, সেজন্য সে রাস্তা পার হয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে। এই ঘটনার পর সোফিয়ার কান্না আর থামল না। এখনো তোমরা লিভারপুলের সেই বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে শুনতে পাবে সোফিয়ার কান্নার আওয়াজ। রূপকথার লেখক সোফিয়া এখন শুধু ক্যাপিকে নিয়েই গল্প লেখেন আর কাঁদেন।

নতুন বই

হাসু কবির

অনেক খুশি হাফসা কবির
পেলো নতুন বই
নতুন বছর নতুন আশা
করে তাই হইচই।

গল্প পড়ে নতুন বইয়ের
কবিতাটাও পড়ে
পড়ার সময় হাসি খুশি
অনেক মজা করে।

ছড়াগুলো রসে ভরা
বলে পড়ার ফাঁকে
সুযোগ পেলেই নতুন বইয়ের
তরুলতা আঁকে।

ফুলের ছবি পাখির ছবি
আঁকে পাহাড় নদী
মনের মতো আঁকত সবি
শিল্পী হতো যদি।

পড়তে বসে ছোট মেয়ে
ভাইবাকে নেয় পাশে
গল্প ছড়া পড়ার সময়
দু'জনেই খুব হাসে।

ছবি: মেনিফার বক জাহীরা, শ্রেণি ২য়
সর্বীশ আলোকের গার্লস কলেজ

স্নিগ্ধ সজীবতা

ওয়াজ কুরুনী সিদ্দিকী

পুব আকাশে সূর্য হাসে
ভোর বিহানে রোজ
পাখির ডাকে জাগে না যে
ক্যামনে পাবে খোঁজ।

মিষ্টি বাতাস সুনীল আকাশ
মাতায় তনু-মন
ঘুমকাতুরে আলসে যে
বুঝবে কি কখন।

মধুমাখা রোদ যে ডাকে
আয়রে কাছে আয়
ক্লান্তি শেষে বসবি এসে
নিবিড় বনছায়।

ঝিরিঝিরি সমীরণে
নাচে লতাপাতা
এসো আনি জীবন জুড়ে
স্নিগ্ধ সজীবতা।

ছোট্ট শিশু

রিয়াজ মাহমুদ রাতুল

অবুঝ প্রাণের সবুজ কুঁড়ি
ছোট্ট শিশু যারা।
শুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা নিয়েই
গড়বে সমাজ তারা।

দেশকে ভালোবাসবে সদা
রাখবে বুকে বল।
ফুটবে হাসি সবার মুখে
মুছে চোখের জল।

আসবে সূর্য নতুন দিনের
বাইবে সুখের বাহন।
সফলতার লিখবে তারা
সুখেরই সাক্ষাহন।

বাঁচবে তারা সত্য নিয়ে
স্বপ্ন পুষে বুকে।
স্বপ্ন তাদের পূর্ণ হলেই
ভরবে ধরা সুখে।

মায়ের খোকা

বারী সুমন

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির
একুশ তারিখ এলে
বুকের ভেতর ভাই হারানোর
ব্যথার প্রদীপ জ্বলে।

মায়ের ভাষার রাখতে মান
বুকের রক্ত ঢেলে
জীবন দিলো বাংলা মায়ের
কত দামাল ছেলে।

আজও খোঁজে সেই ছেলেকে
প্রভাতফেরির ভিড়ে
মায়ের মনে আশা জাগে
আসবে খোকা ফিরে।

স্বপ্ন

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

আপন ভাইবোন আমরা দু'জন
মনে অনেক স্বপন।
লেখাপড়া শিখে আমরা
স্বপ্ন করব পূরণ।

ধরায় আছে যত জরা
নিত্য করব নির্মল।
ব্যর্থতার সিঁড়ি ভেঙে
আমরা হব সফল।

মিথ্যার দোরে আঘাত করে
সত্য আনব ফিরে।
থাকবে মানুষ ক্ষিতির পরে
সুখের পরশ ঘিরে।

ছবি: আহমেদ ফারহান শাকিক, অষ্টম শ্রেণি, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

ছবি: নীলা আহসান
আশাশুনি, সাতক্ষীরা

ছবি: শাইমা রহমান প্রেমা
শিকারুননিসা নূন স্কুল
বেইলি রোড, ঢাকা

ছবি: সুরাইয়া রহমান জেসিকা
শিক্ষার্থী, রায়েরমহল, খুলনা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ০৮ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও একএম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১০ তাবার গান। আবিদা সুলতানা

১২-১৫ আমাদের জন্ম হলো।
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে নিওতি'র নাটক
মূল রচনা: সৈয়দ শামসুল হক
প্রযোজনা: রামেন্দু মজুমদার

২-০০ একুশ আমার চেতনার পাখি:
বিশেষ গীতিমহলা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা। রফিকুর রশীদ
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা।
মোঃ শাহনেওয়াজ
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৮৩ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং একএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৬-৫৫ তাবার গান: এ্যাচ্ছু কিশোর

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৮৩ কিলোহার্জ এবং একএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৭-৩০ মননে মুক্তিযুদ্ধ।
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
ক. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নিয়ে
প্রামাণ্য: মোঃ জসিমউদ্দিন
খ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ থেকে পাঠ,
গ্রন্থ। আরেক ফাল্গুন,
পর্যালোচনা।
এজতোকেট নাসরিন রহমান
গ. বীর সেনানী।
তাবাসৈনিক আবুল খায়ের চৌধুরী
এর স্মৃতিচারণ (আর্কাইভ থেকে)
ঘ. তাবার গান:
আমার সোনার দাও না মাগো:
রুনা লায়লা
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
খন্দকার ইখতিয়ার উদ্দিন
উপস্থাপনা।
ফাতেমা আকতারুজ সোহেলী
প্রযোজনা: ফারজানা

৮-১৫ পলাশ রাঙা একুশ।
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবস উপলক্ষ্যে দিবসভিত্তিক গ্রন্থনা
খ. ১৯৫২ এ ভাষা আন্দোলনের
উপর স্মৃতিচারণ:
তাবাসৈনিক প্রয়াত
অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম
গ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের
স্বীকৃতি অর্জন ও
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর গুরুত্ব।
এম হুমায়ুন কবীর
ঘ. গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:
সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ